শুকতারা

৫৪

তৃতীয় সংখ্যা
বৈশাখ • ১৪০৮
১০.০০

ভারতবর্ষে সবাধিক বিক্রীত কমিকস

ডায়মণ্ড কমিকস

এই মাসে পড়ুন

25/- টাকার উপহার
এই সংখ্যার সঙ্গে

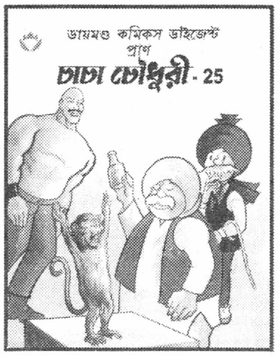

25/- টাকার উপহার
এই সংখ্যার সঙ্গে

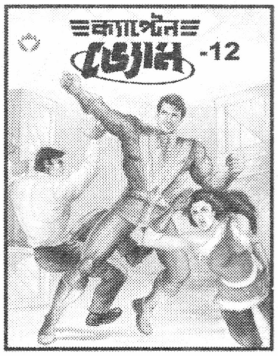

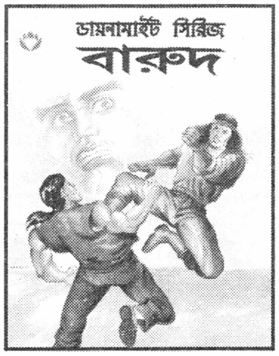

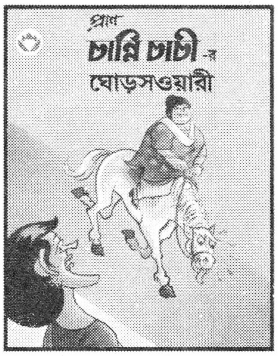

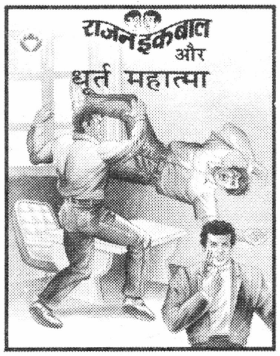

ডায়মণ্ড কমিকস বুক ক্লাব -এর সদস্য হোন এবং বাড়ী বসে ৫০ টাকার কমিকস ৪৫ টাকায় নিন। ডাক ব্যয় ৬ টাকাও আর আলাদা করে নিতে হবে না। এই ভাবে প্রতি মাসে ডায়মণ্ড কমিকসের ৫-টি কমিকসের সেট আপনি বাড়ী বসেই পেতে পারেন। এই স্কীম কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশ বা ভারতের বাইরে আর কোন দেশে প্রযোজ্য হবে না। সদস্যতা কুপন ভরে পাঠাবার সময়ই সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা আপনি ডাক টিকিটের মাধ্যমে পাঠান। নিজের নাম- এবং ঠিকানা ইংরাজীতে স্পষ্ট করে লিখুন। সময়ে-সময়ে আপনাকে অন্যান্য উপহারও পাঠানো হবে। লাগাতার ১২-টি ভি.পি. ছাড়ালে ১৩ নম্বর ভি.পি. ফ্রী! ডায়মণ্ড পরিবারের সদস্য হোন এবং মনোরঞ্জনের দুনিয়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলুন।

এক বছরে মাস	কনশেসন (টাকা)	মোট সঞ্চয় (টাকা)
১২	৫.০০ (কনশেসন)	৬০.০০
১২	৬.০০ (ডাক খরচ)	৭২.০০
১	৫০.০০ (১৩ নং ভি.পি. ফ্রী)	৫০.০০
সদস্যতা প্রমাণপত্র এবং অন্য আকর্ষক উপহার, স্টিকার এবং ডায়মণ্ড পুস্তক সমাচার ফ্রী		২০.০০
		২০২.০০

সদস্য হওয়ার জন্য আপনি কেবল নীচের কুপনটি ভরে পাঠান এবং সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা ডাক টিকিট অথবা মানি অর্ডারের রূপে অবশ্যই পাঠান। এই স্কীমের অন্তর্গত প্রতি মাসে ২০ তারিখে আপনাকে ভি.পি. পাঠানো হবে, যাতে ৬-টি কমিকস থাকবে।

হ্যাঁ! আমি **'ডায়মণ্ড কমিকস বুক ক্লাব'**-এর সদস্য হতে চাই এবং আপনাদের দ্বারা দেওয়া সুবিধাগুলো পেতে চাই। আমি নিয়মগুলো ভাল করে পড়ে নিয়েছি। আমি কথা দিচ্ছি প্রতি মাসে ভি. পি. ছাড়িয়ে নেব।

নাম ঃ ______________________

ঠিকানা ঃ ______________________

পোস্ট ঃ ______________ জেলা ঃ ______________

পিন কোড ঃ ______________________

সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা ডাক টিকিট / মানি অর্ডারের রূপে পাঠাচ্ছি।

আমার জন্মদিন ঃ ______________________

নোট ঃ সদস্যতা শুল্ক পাওয়ার পরই সদস্যতা দেওয়া হবে।

এই স্কীম কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাংলাদেশ অথবা অন্য কোন দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়!

ডায়মণ্ড কমিকস প্রা. লি. A-11, সেক্টর-58 নয়ডা-201301 (উ. প্র.)

বাঁটুল দি গ্রেট

ভূমিকম্পে দুর্গতদের সাহায্যার্থে আসছে সপ্তাহে টাউনহলে কিক বক্সিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। দেশের সেরা লড়িয়েরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। টিকিটের হার যথাক্রমে একশো পঞ্চাশ আর পঁচিশ। সত্বর আসন সংগ্রহ করুন।
ইস্! ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিলো। চেঁচিয়ে কি বলতে বলতে গেলো রে?
আসছে সপ্তাহে টাউনহলে ভূমিকম্পে দুর্গতদের সাহায্যের জন্যে কিলড়াইয়ের প্রতিযোগিতা হবে তাই বলে গেলো।
দুর্গতদের জন্যে লড়াই সেটা আবার কি?
আমি সব শুনেছি, বাঁটুলদা! ওরা দুর্গতদের জন্যে দেশের বড়ো বড়ো কিকবক্সারদের দিয়ে কিকবক্সিং লড়াইয়ের আয়োজন করেছে। একশো, পঞ্চাশ, পঁচিশ টাকা করে টিকিট!
তাই নাকি! তাহলে তো টিকিট কাটতেই হয়, বাচ্চুরা!
চলো তাহলে টাউনহলে।
ভালো জায়গা দেখে একশোটাকার তিনটে টিকিট দিন।
এই নিন একেবারে সামনের টিকিট দিলুম।
একটা কথা বলছি শুনুন, যিনি টিকিট কিনলেন তিনিও নিজে এই লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক।
বটে! ভালোই হলো, অন্য প্রদেশের লড়িয়েদের সঙ্গে স্থানীয় একজন থাকলো!
বুঝলি, দোস্ত! এই কিকবক্সিংয়ের লড়াইয়ে আমি বাঁটুলদার নাম ঢুকিয়ে দিয়েছি। প্রেসটিজ বাঁচাতে বাঁটুলদাকে লড়তেই হবে, তখন বড়ো লড়িয়েদের গুঁতো খেয়ে হাত পা ভেঙে খুঁতো হয়ে থাকতে হবে।
প্রতিযোগিতার দিন টাউনহলে-
এবার প্রতিযোগিতা শুরু হলো।

ওর্‌ফস্‌!
আউফস্‌!
চারঘণ্টা প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর·
দর্শকমণ্ডলী! এই মামড়া সিং হচ্ছে আজকের সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ান, শুধু নাম ঘোষণার আগে একটা এলেবেলে লড়াই আছে একজনের সঙ্গে।
এসো হে! শেষ লড়াইটা তোমার সঙ্গে। অবশ্য দু'সেকেণ্ডের মধ্যেই ফয়সালা হয়ে যাবে!
হাঃ হাঃ! হোঃ হোঃ!
আমি?
একটাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট!
পাজিদুটো জেনে বুঝে এই কাণ্ড করে।
তাজ্জব! কিছুতেই একে কায়দা করতে পারছি নাতো!
দশমিনিট ব্যর্থ চেষ্টার পর-
যথেষ্ট হয়েছে, এবার আপনার নিজের নিরাপত্তার জন্যেই টোকা মারতে হোলো।
মাননীয় দর্শকবৃন্দ! আমি যে এতক্ষণ ওর আঘাতগুলো পাশ কাটালাম সেটা শুধু ওরই নিরাপত্তার স্বার্থে। আমার সঙ্গে সংঘাত হলে ওর হাত পা কোনটাই আস্ত থাকতো না, কাজেই–
ওকে থামাতে আমার টোকা মারা ছাড়া কোন উপায় ছিলো না!
সুস্থ হলে ওটা ওর গলাতেই ঝুলিয়ে দেবেন।
যা খেল দেখালে! উফ্‌, টোকায় অজ্ঞান! এবার চ্যাম্পিয়ানের এই পদকটা–

শুকতারা

সূচীপত্র

বৈশাখ ১৪০৮
এপ্রিল ২০০১
বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

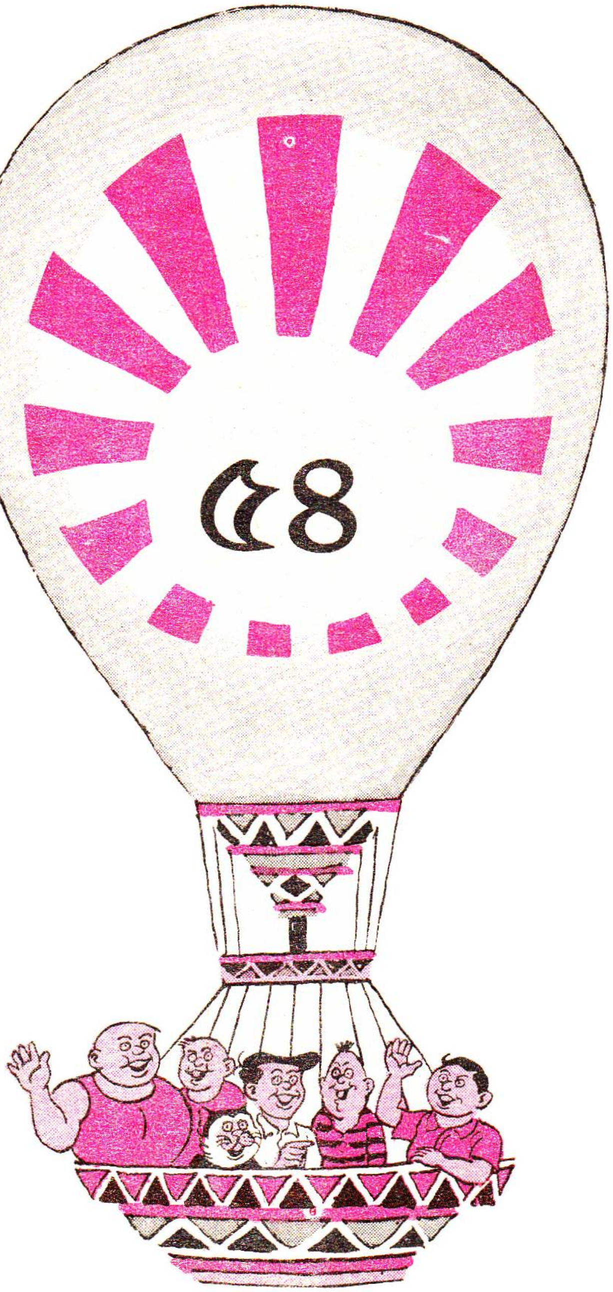

বিশেষ নববর্ষ সংখ্যা

বৈশাখ মাস বাঙালীর নববর্ষ। নতুন বছরের শুরুতেই যদি একটা উপহার পাও, কেমন লাগবে? দারুণ! তাই না? তোমাদের সবাইকে ভাল লাগার আনন্দে মাতোয়ারা করতে এসেছে শুকতারার বিশেষ বৈশাখী অর্থাৎ নববর্ষ সংখ্যা।

লিখছেন ঃ

রামপুরের মানুষ-খেকো (কর্নেল কাহিনী)
—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৬
জিহাদপুরের সেই লোকটা (ভূতের)
—অনীশ দেব ২৫
উপহার (ভূতের)
—ডঃ গৌরী দে ১৭
মগলু কাহিনী (কল্প বিজ্ঞান)
—নিরঞ্জন সিংহ ৫৮
গোপালের পাটিসাপটা (হাসির)
—শুভমানস ঘোষ ৭১
মেধা ও বিত্ত (রূপকথা)
—কিরণশঙ্কর মৈত্র ৬৬
খেজুর রস
—অমর রাউত ১০
গুপ্তধন
—পাঁচু গোপাল মণ্ডল ১৫

Approved by the Directorate of Public Instruction West Bengal as Children's Monthly Magazine Vide Memo No. 456 (17) T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য হাতে নিলে ১১০ টাকা, ডাকে ঃ বুকপোস্টে ১৫০ টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ২৬০ টাকা।

Annual Subscription : UK and USA - By Air Mail Rs. 645.00

R.N.I Registration No. 2621/57

মূল্য ঃ দশ টাকা

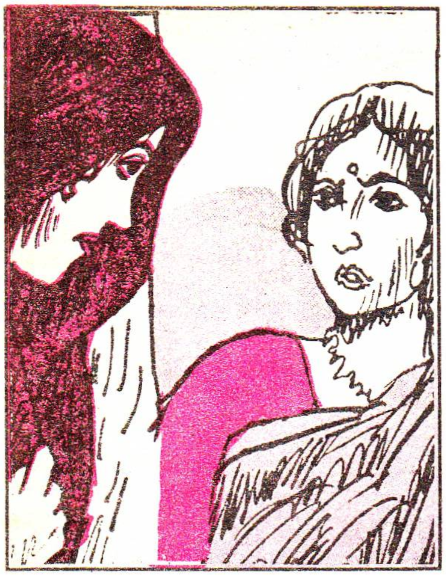

২৪

সেরা চিঠি লিখলেই পুরস্কার। ভাবনা-চিন্তা করে চিঠি লেখ চিঠিপত্র-র পাতায় আর চটপট জিতে নাও ১০০ টাকা পুরস্কার।

৩৭

রাস্তা থেকে তুলে এনে বাড়িতে যাকে আশ্রয় দিলেন পাটনার ডাঃ ব্যানার্জি, সে তার পূর্ব পরিচয় কিছুই বলতে পারে না। এদিকে বাড়ির ওপর নজর রাখছে কেউ। গোয়েন্দা-প্রবর বিল্লু নেমে পড়ল তদন্তে: মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা ধারাবাহিক দ্বিতীয় মাণিক্য

১৯

বিশ্বাসঘাতকের একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু। কিন্তু প্রহরীবেষ্টিত জেল-হাসপাতালে কি করে প্রবেশ করবেন বিপ্লবীরা? তাঁরা তাই করেছিলেন এবং শাস্তিও দিয়েছিলেন। কি করে? শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফিরে দেখা-য় পাবে সে কাহিনী।

৩০

যে সব কথা তোমরা কাউকে বলতে পারো না অথচ উত্তর খুঁজে বেড়াও, তোমাদের সেই সব সমস্যার সমাধান পাবে শুকতারার পাতায়। তোমাদের চিঠির উত্তর দিচ্ছেন জগদিন্দ্র মণ্ডল মনের জানলা-য়।

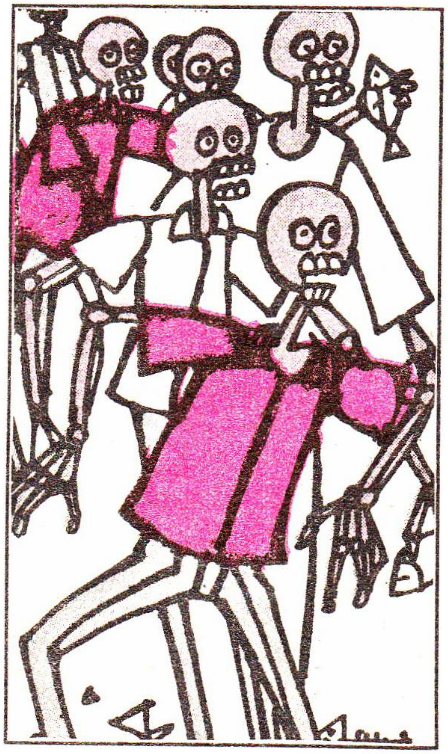

৫০

পশ্চিমবঙ্গে নয়, এবার পশ্চিম-বঙ্গের বাইরে বিভিন্ন কোর্স পড়ার সুযোগ-সুবিধার কথা জানিয়েছেন ডি. এ. চন্দ্রণ তাঁর কেরিয়ার গাইড-এ।

পুরস্কৃত গল্প

৫২

ফুল ঝরে যায় (প্রথম)
—সমীর কুমার ঘোষ
গোলাপ কুঁড়ি (দ্বিতীয়)
—পল্লবী সেনগুপ্ত ৫৪

৪১

নাটক
নাট্যে কথামৃত
—জ্যোতিভূষণ চাকী
ফিচার
গল্প হলেও সত্যি
—তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬
বিজ্ঞানের খবর
—সন্দীপ সেন ৪০
বিচিত্র খবর
—বরুণ মজুমদার ২৩
জানা-অজানা
—মহসীন মল্লিক ৫১
আবিষ্কার—দীপক কুমার রায় ৬১
ক্রীড়াঙ্গন
খেলা—শা. প্রি. ব ৪২
উঠছে যারা —বীরু বসু ৪৯
শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম
—তুষার শীল ৪৮
কবিতা ও ছড়া
তিন বুড়ি
—গৌরাঙ্গ ভৌমিক ৫
নববর্ষের ছড়া
—শ্যামাপদ কর্মকার ৬৫
দুই বেড়াল
—সুবীর গুপ্ত ৬৫
কি বললে কি
—সুনীতি মুখোপাধ্যায় ৬৫
বিভাগীয় লেখা
আমরা বলছি ৩৪
দাদুমণির চিঠি ৩১
তোমাদের পাতা ৩২
মজার পাতা ৬২

১

বাঁটুল দি গ্রেট
—নারায়ণ দেবনাথ
হাঁদা-ভোঁদা
—নারায়ণ দেবনাথ ২৮
ব্ল্যাক ক্যাট ৫৬
প্রচ্ছদ ঃ খুনে বিজ্ঞানীর দ্বীপে
—নারায়ণ দেবনাথ
ঘোষণা
সুলেখা দাস স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতা ৫৫
জানো কী! ৫৩

৫৪ বর্ষ ● ৩য় সংখ্যা ● বৈশাখ ১৪০৮ ● এপ্রিল ২০০১

তিন বুড়ি

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

ছিঁচকাঁদুনে তিনটে বুড়ির
তিরিশ রকম বায়না,
একটা যদি মালপো বানায়
আরেকটা তা খায় না।

দু'গাল ফোলায় অভিমানে,
অভিমানই সম্বল।
চোখের জলে ডালনা রাঁধে,
চোখের জলে অম্বল।

মেঘলা দিনে প্রহর গোনে
বকুলতলায় বসে,
মানসাঙ্কের ফল মেলে না
ভুলো মনের দোষে।

বিলাপ করে তারা যখন
সন্ধ্যেবেলায় কাঁদে,
সঙ্কীর্তনের দোহারি গায়
রাধে কৃষ্ণ রাধে।

ছবি ঃ সুফি

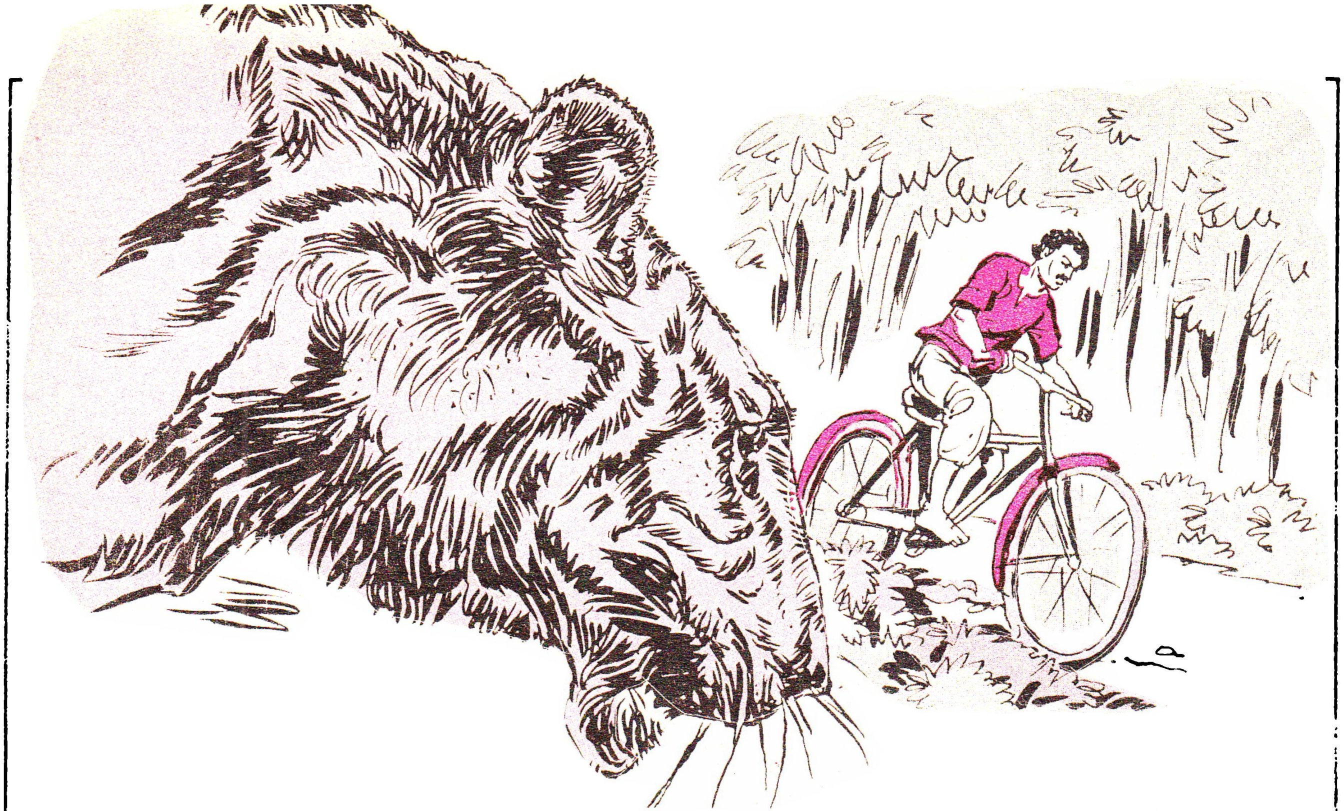

রামপুরের মানুষ-খেকো

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সেই ছোট্ট, অথচ রীতিমতো রোমাঞ্চকর ঘটনাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম এবং ভুলেই থাকতুম, যদি না গত রবিবার আমার বৃদ্ধ বন্ধু প্রকৃতিবিদ কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের হাতে রাইফেলটা দেখতে পেতুম।

রাইফেলটা খুলে উনি লোশন দিয়ে পরিষ্কার করছিলেন। সামরিক জীবনে তো উনি সাংঘাতিক সব আগ্নেয়াস্ত্র ঘেঁটেছেন। কিন্তু অবসর জীবনে একসময় ওঁর শিকারের নেশা ছিল এবং এই রাইফেলটা তারই নিদর্শন। আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর যে-কর্নেলকে দেখেছিলুম, তিনি তখন শিকারী নন। প্রকৃতিবিজ্ঞানী হয়ে উঠেছেন। বিরল প্রজাতির পাখি-প্রজাপতি-অর্কিডের খোঁজে বনজঙ্গল পাহাড়-পর্বত—যত রকমের দুর্গম জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তবে—নাঃ! শিকারী নন বলাটা ঠিক হবে না। কর্নেল তখন অপরাধীদের শিকার করার সুযোগ পেলেই তাদের পিছনে ছোটাছুটি করেন।

তো সেদিন কর্নেলকে রাইফেলটা পরিষ্কার করতে দেখে বললুম—কী ব্যাপার? আবার কি বন্যজন্তু শিকার করতে বেরুবেন নাকি? আপনার জানা উচিত, এখন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের আইন খুব কড়া।

কর্নেল হাসলেন।—জয়ন্ত! এই রাইফেলটা দেখে তোমার কি মনে পড়ছে না রামপুরের জঙ্গলে সেই অদ্ভুত মানুষ-খেকো বাঘটার কথা?

অমনি ঘটনাটা আমার মনে পড়ে গেল।

অনেক বছর আগের কথা। সেবার ডিসেম্বর মাসে প্রচণ্ড শীতের সময় কর্নেলের সঙ্গে রামপুরের জঙ্গলে ফরেস্ট বাংলোয় উঠেছিলুম। তখনই একটা মানুষ-খেকো বাঘের কথা চৌকিদারের মুখে শুনেছিলুম।

পরদিন সকালে হঠাৎ দেখি পুলিশের জিপে চেপে একজন পুলিশ অফিসার কর্নেলের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কর্নেল আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন। ইনি রামপুর এলাকার পুলিশ সুপার। তাঁর নাম রাজাধিরাজ সিংহ।

মিঃ সিংহের কাছে কর্নেল মানুষ-খেকো বাঘটার খবরাখবর নিলেন। মিঃ সিংহ যা জানালেন, তা সংক্ষেপে এরকম ঃ

ক'দিন আগে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যে হাইওয়ে গেছে, তিনজন লোক সাইকেল চেপে আসছিল, একের পর এক—কেউ পাশাপাশি ছিল না। প্রথম সাইকেলটা বাঁকের দশ গজ দূরে যখন, তখন হঠাৎ বাঁ-দিকের পাথরের পাঁচিলে একটা বাঘ উঠে আসে। ব্রেক কষবার আগেই সে রাস্তার মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে। তার ফলে সাইকেলের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগে। অমনি সে গর্জন করে ওঠে। এদিকে লোকটা সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে ছিটকে সরে আসে, সাইকেলটা পড়ে যায় এবং চাকা ঘুরতে থাকে। পিছনের লোকদুটো কিছু লক্ষ্য করেনি। তাই তারাও এসে প্রথম সাইকেলটার ওপর একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং সামনে বাঘ দেখে লাফ দিয়ে সরে আসে। তিনটে সাইকেলের চাকা বোঁ বোঁ করে তখন ঘুরছে এবং একটা বাঘ ক্ষেপে গিয়ে থাবা মারছে একবার এটায়, একবার অন্যটায় আর প্রচণ্ড গর্জাচ্ছে।

অন্যদিকে পাথরের গায়ে সেঁটে তিনটে ভয়-পাওয়া মানুষ কাঠ হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে! তাদের পালাবার ক্ষমতাও নেই।

বাঘটা কিছুক্ষণ সাইকেল তিনটের সঙ্গে লড়াই করার পর বিরক্ত হয়েই যেন শেষ ডাক ছেড়ে ডান-দিকের পাঁচিলে লাফিয়ে ওঠে এবং অদৃশ্য হয়। তখন লোক তিনটে ধীরে সুস্থে সাইকেলের কাছে আসে। আশ্চর্য, সাইকেলের কোনো ক্ষতিই হয়নি।

তারা এরপর কী করেছিল বোঝাই যায়। ঘণ্টায় কমপক্ষে পঞ্চাশ-ষাট মাইল বেগে পালিয়ে যাওয়া এক্ষেত্রে স্বাভাবিক। প্রথমেই যে বসতিতে তারা পৌঁছয়, সেখানে হুলুস্থুল শুরু হয়েছিল। কারণ লোকেরা দেখে, তিনটে সাইকেলওয়ালা আচমকা ঝড়ের মতো এসে সাইকেল থেকে লাফ দিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। সাইকেলগুলো আবার চারদিকে ছিটকে পড়ে।

জ্ঞান হলে তাদের মুখে সব জানা যায়। কিন্তু ঘটনার শেষ এখানে নয়। পরদিন সকালে দেখা গেল, সেই বসতির এক বুড়ি উঠোনে পড়ে আছে। ক্ষতবিক্ষত শরীর। বোঝা যায় বাঘটা টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল বুড়িকে—পারেনি। কেন পারেনি কে জানে। কিন্তু পায়ের খানিকটা মাংস খুবলে খেয়ে গেছে।

এরপর দ্বিতীয় শিকারের খবর পাওয়া গেল মাঠের ক্ষেতে। একটা বুড়ো ঘাস কাটতে গিয়েছিল বিকেলে। কিন্তু রাতেও সে ফিরল না। ব্যাপারটা অনুমান করে গাঁয়ের লোক পরামর্শে বসল। কিন্তু রাতের বেলায় সাহস করে কেউ খুঁজতে বের হলো না। পরদিন সকালে দেখা গেল একই দৃশ্য। এবারেও বাঘটা বুকের কিছুটা খেয়েছে—টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। পারেনি।

আজ সকালে ঘটেছে আরেক বীভৎস কাণ্ড। সেই গাঁয়ের মোড়লকে বাঘটা একইভাবে মেরে রেখে গেছে। মোড়লের বাড়ির পিছনে জঙ্গল আছে। তার নিচে ধাপবন্দী পাহাড়ী ক্ষেত। মোড়লকে সম্ভবত শেষরাতে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু এবার বাঘটা ঘরে ঢুকেছিল। ঘর থেকে তাকে টেনে উঠোন পার করে ক্ষেতে নিয়ে যায়। তারপর একইভাবে বুকের খানিকটা খেয়ে রেখে যায়। লাশটা এখনও রয়েছে। কাছেই দু'টো গাছে দু'টো মাচান বাঁধা হয়েছে। কর্নেল এবং মিঃ সিংহ সেখানে বাঘটার আশায় বন্দুক হাতে অপেক্ষা করবেন।

কর্নেল আরও জানালেন, প্রথম ঘটনার পরই সরকারী শিকারীরা লাশের কাছে ওঁৎ পেতে রাত জাগেন। কিন্তু বাঘটা আর আসেনি। দ্বিতীয় লাশের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। এ থেকে মনে হচ্ছে, মোড়লের লাশের কাছেও সে আসবে কিনা সন্দেহ। তবে..........

ওঁকে চুপ করতে দেখে মিঃ সিংহ বললেন—তবে কী কর্নেল?

কর্নেল কেমন হেসে বললেন—আমার ধারণা এবার বাঘটা আসার চান্স আছে। অন্তত যদি বুদ্ধিমান বাঘ হয়, তাহলে তো আসা একান্ত উচিত। না এলেই যে সে প্রাণে মারা পড়বে!

আমরা দু'জনেই হতভম্ব হয়ে গেলুম। বলেন কী! বাঘটা মড়ির কাছে না এলে মারা পড়বে! এ কী উদ্ভট কথা! মড়ির কাছে এলে তবে না গুলি খেয়ে বাঘ মারা পড়ে। মিঃ সিংহ অবাক হয়ে বললেন—এ হেঁয়ালির মানে কী কর্নেল?

হেঁয়ালি? মোটেও না! বলে কর্নেল ঘনঘন মাথা নাড়তে থাকলেন। একটু পরে বললেন—বুঝলেন না? বাঘ মানুষ-খেকো হয় কেন? যখন শিকার ধরবার স্বাভাবিক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, তখন বাঘ সবচেয়ে সহজে ধরার মতো শিকার মানুষের ওপর হামলা করে। এই বাঘটার ব্যাপার-স্যাপারগুলো দেখুন। প্রথম ঘটনা সেই সাইকেল পর্ব। ওই অবস্থায় বাঘ বিরক্ত হয়ে ওদের আক্রমণ করাটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা করেনি। বোঝা যায়, বাঘটার মধ্যে সুস্থতার লেশমাত্র নেই। অর্থাৎ সে ভীতু, কিম্বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিজাত ক্ষমতা তার মধ্যে নেই। এ অবস্থা বাঘের কখন হয়? যখন কোনো কারণে সে শারীরিক কিছু দরকারী ক্ষমতা হারায়। এটা নিছক বার্ধক্যের দরুন না হতেও পারে। বরং কোনো শিকারীর গুলিতে সে স্বাভাবিক তৎপরতা হারিয়ে অক্ষম হয়ে গেছে, কিম্বা কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী জন্তুর সঙ্গে যুদ্ধে তা হারিয়েছে। এই বাঘটার প্রথম একটা বৈশিষ্ট্য দেখুন—সে তার মড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে নিরাপদ জায়গায় লুকোতে পারে না। অর্থাৎ তার শিকার বইবার ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—সে আর মড়ির কাছে ফেরে না। তার মানে, নিশ্চয় কোথাও মড়ির ওপর বসা অবস্থায় গুলি খেয়েছিল।

মিঃ সিংহ বললেন—তাহলে বলছেন কেন সে মোড়লের মড়ির কাছে এবার ফিরবেই?

মোড়লকে বাঘটা মেরে রেখে গেছে।

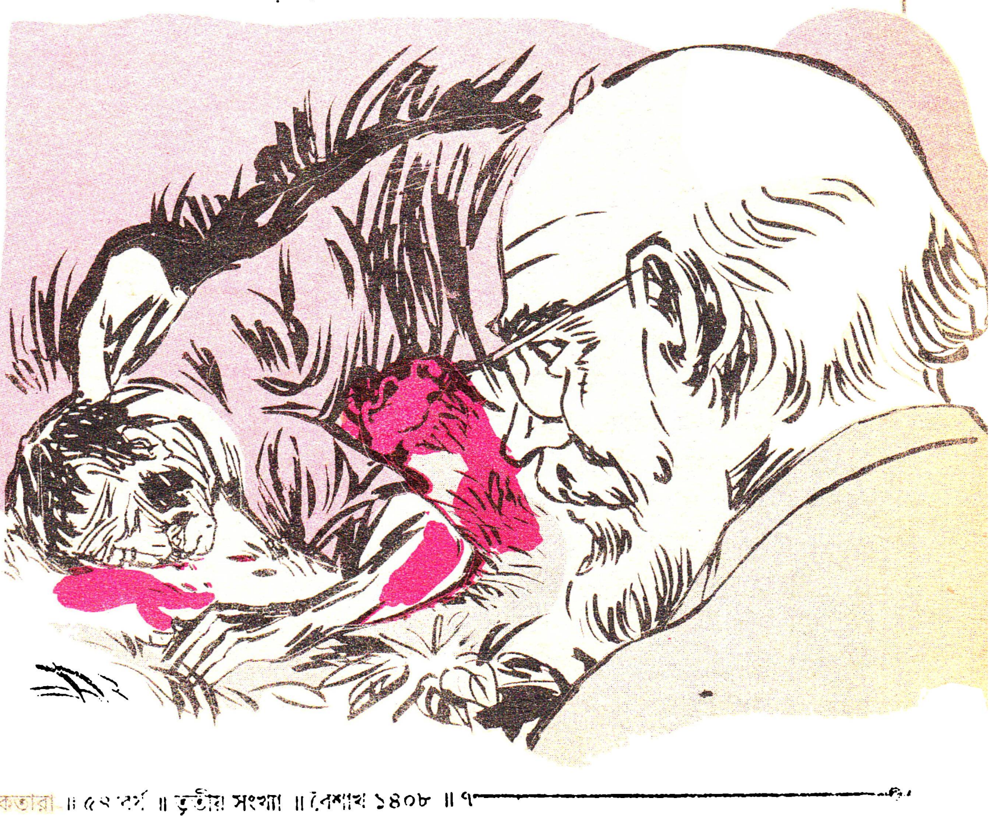

কোনোরকম নড়াচড়া চলবে না।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—না এলে যে খিদের জ্বালায় মরতে হবে ওকে! প্রতিবার মড়ি পেট পুরে না খেয়ে পালাবে নাকি? খিদের জ্বালা বড় জ্বালা। এবার হয় তো সে একটা রিস্ক নেবে।

এই ব্যাখ্যায় মিঃ সিংহ সন্তুষ্ট হলেন কিন্তু আমি হলুম না। এই বুড়ো ঘুঘুকে তো হাড়ে হাড়ে চিনি। ওঁর হেঁয়ালি বোঝার ক্ষমতা কারও নেই।

কথা হলো, আমরা ঠিক সূর্যাস্তের আগে সেই গাঁয়ে যাব এবং মড়ির কাছে মাচানে উঠব। তখনও ঘণ্টা দুই দেরি। আমি গড়িয়ে নিতে গেলুম ততক্ষণ। মিঃ সিংহ সেই ফাঁকে তাঁর জরুরি কয়েকটা ফাইল নিয়ে বসলেন—থানা থেকে লোক এসেছিল। আর কর্নেল বেরোলেন। বলে গেলেন—গ্রামেই অপেক্ষা করব আপনাদের জন্যে। আপনারা টাইমলি চলে যাবেন।

রাইফেল হাতে কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। এটা ওঁর পক্ষে স্বাভাবিক। সব কাজ ভালভাবে খুঁটিয়ে না দেখে এগোবেন না। গ্রামে গিয়ে হয়তো বাঘটার সম্পর্কে আরও খবর জেনে নেবেন।

সূর্য ডুবতে ডুবতে আমি আর মিঃ সিংহ জিপে করে যথাস্থানে গেলুম। জিপটা গাঁয়ের কাছারির সামনে রেখে পায়ে হেঁটে আমরা ধাপবন্দী পাহাড়ী ক্ষেত ধরে এগোচ্ছি, হঠাৎ দেখি কর্নেল একটা কাঁটাঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন।

কাছে গেলে বললেন—আসুন মিঃ সিংহ। এস জয়ন্ত ডার্লিং। গুড ইভনিং!

মিঃ সিংহ বললেন—এখানে কী করছেন কর্নেল?

কর্নেল ঝোপে আটকানো একটা কাপড় দেখিয়ে বললেন—এটা পরীক্ষা করছিলুম। মোড়লের জামাটা আটকে আছে। চলুন, মাচানে ওঠার সময় হয়ে গেছে।

লাশটা দেখে আমি শিউরে উঠলুম। আর দ্বিতীয়বার তাকাবার সাহস হলো না। দশ গজ চওড়া পনের গজ লম্বা ছোট্ট ক্ষেতের মধ্যিখানে সেটা পড়ে আছে এক পাশে কাত হয়ে। বীভৎস! তার পশ্চিমে একটা মস্ত নিমগাছ—সেখানে বিশ ফুট উঁচুতে মাচান দেখলুম। কর্নেল বললেন—মিঃ সিংহ, আপনি ওই মাচানে উঠুন। একটা কথা বলে রাখি। আমি শিস না দিলে কিন্তু কোনো প্রলোভনেও গুলি করবেন না—প্লীজ, কথা দিন।

মিঃ সিংহ বললেন—অবশ্যই। কথা দিচ্ছি।

কর্নেল আমার দিকে ঘুরে বললেন—ডার্লিং, তোমাকেই গুলি করার সুযোগটা দিতে চাই! এই নাও রাইফেল। এবার দেখব, তোমার হাতের টিপ কেমন! কিন্তু মনে রেখো, আমি শিস না দিলে তুমিও গুলি ছুঁড়বে না। কথা দাও।

এরপরে তাঁর সঙ্গে আমি পুবদিকের একটা গাছের মাচানে উঠলুম।

কোনোরকম নড়াচড়া চলবে না। চুপচাপ বসে রইলুম। দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠল। সময় কাটতেই চায় না। তারপর আমাদের পিছনে চাঁদ উঠলে স্বস্তি পেলুম। হালকা জ্যোৎস্না গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মড়ির ওপর পড়ল। আরও কিছুক্ষণ পরে মড়িটা জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু বাঘের কোনো লক্ষণ নেই। ঝিঁঝিঁ ডাকছে একটানা। অনেক দূরে একবার শেয়াল ডাকল। তারপর আবার সব স্তব্ধ হয়ে গেল। গ্রামের দিকে শেষ আলোটিও নিভে গেল। চোখ জ্বালা করতে লাগল—একদৃষ্টে কতক্ষণ আর তাকিয়ে থাকা যায়! আস্তে আস্তে উত্তেজনা থিতিয়ে একটা ঝিমধরা ভাব জাগল শরীরে। রাইফেলটা অসম্ভব ভারী লাগছিল। একবার হাত-পা ছড়াতে পারলে আরাম পাওয়া যেত। কিন্তু নড়াচড়া করা বারণ।

গ্রামের দিকে সেই সময় কুকুরের ডাক শোনা গেল। কুকুরগুলোর বোকামি দেখে রাগ হচ্ছিল—কারণ ওরা ডাকতে ডাকতে এদিকেই আসছে মনে হচ্ছিল—সাবধানে কর্নেলের দিকে ঘুরলুম। দেখি, তাঁর চোখ দুটো যেন জ্বলছে এবং কখন হুমড়ি খেয়ে বসে কিছু দেখছেন, লক্ষ্য করিনি। কুকুরের ডাক থেমে গেলে কর্নেল নড়ে বসলেন। এটা কি ঠিক হলো? বাঘের চোখ খুব তীক্ষ্ণ। বিন্দুমাত্র নড়াচড়া সে টের পেয়ে যায়। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমাকে আরও অবাক করে কর্নেল দেখলুম পা বাড়াচ্ছেন।

এক পা নামিয়েছেন, যেন নামতে যাচ্ছেন। ফিসফিস করে ওঠার আগেই উনি আমার হাঁটুতে চাপ দিয়ে চুপ করার ইঙ্গিত দিলেন। তখন হতভম্ব হয়ে বসে ওঁর কাণ্ড দেখতে থাকলুম।

কর্নেল নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমে গেলেন। তারপর আর ওঁকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও দেখতে পেলুম না। ব্যাপারটা কী? যেচে বিপদের মুখে পড়তে গেলেন কেন?

হঠাৎ আমার চোখ গেল মড়ির দিকে। কী একটা কালো বস্তু নড়াচড়া করছে ওখানে? তাহলে বাঘটা এসে গেছে! কিন্তু কর্নেলের শিস না শুনলে গুলি করা বারণ। হাত নিশপিশ করতে থাকল। কালো জন্তুটা কিন্তু মড়িতে বসল না। আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। তখন মনে হলো, ওটা তাহলে বাঘ নয়—সম্ভবত হায়েনা অথবা ভালুক। তা যদি হয়, তাহলে বোঝা যাচ্ছে বাঘটার আসা এখন অনিশ্চিত হয়ে গেল।

আমার চোখ ছিল জন্তুটার দিকে। একটু পরে সেটা মড়ির কাছে স্থির হয়ে বসতেই দেখলুম, আমাদের মাচানের তলা থেকে আরেকটা জন্তু হামাগুড়ি দেওয়া মানুষের মতো এগোচ্ছে। চাঁদের আলো এই জায়গায় স্পষ্ট নয়—ছায়া আছে। কিন্তু জন্তুটা যে মড়ির দিকে এগোচ্ছে, তা ঠিক। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে দেখতে থাকলুম।

দ্বিতীয় জন্তুটা মড়ির কাছাকাছি যেতেই প্রথম জন্তুটা যেন লাফ দিয়ে উঠল। সে পালিয়ে যাবার তালে—তার ভঙ্গি দেখেই সেটা বোঝা গেল। কিন্তু অমনি দ্বিতীয় জন্তুটা তার ওপর ঝাঁপ দিল। নির্ঘাৎ মড়ি নিয়ে হায়েনা আর ভালুকে লড়াই বাধল।

কিন্তু সেই মুহূর্তে কর্নেলের চিৎকার শুনলাম, আর টর্চও জ্বলে উঠল। কর্নেল ডাকছিলেন—মিঃ সিংহ! জয়ন্ত! চলে এসো। বাঘ ধরেছি!

বাঘ ধরেছেন! আমি মাচান থেকে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নেমে গেলুম। মিঃ সিংহও ততক্ষণে এসে পড়েছেন। হাতে টর্চ। গিয়ে দেখি, যে দুটো কালো জিনিসকে জন্তু ভেবেছিলুম—তা মানুষ এবং প্রথম জন্তুটা একজন অচেনা মানুষ, দ্বিতীয় জন্তুটা স্বয়ং কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। লোকটাকে উনি জাপটে ধরে আছেন—লোকটার হাতে একটা বড় ছোরা। হাতদুটোসুদ্ধ ধরে কর্নেল ওকে বেকায়দায় ফেলেছেন।

মিঃ সিংহ ছোরাটা কেড়ে নিয়ে হুইসেল বাজিয়ে দিলেন। অমনি গাঁয়ের দিক থেকে টর্চ জ্বেলে কারা সব দৌড়ে এল। ধুপধাপ শব্দ শুনে বুঝলুম, সবাই পুলিশ!

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কোথায় ম্যান-ইটার? এ যে নিতান্ত মানুষ!

বাংলোয় ফিরতে রাত একটা বেজেছে। ফেরার পর কর্নেল বললেন—জয়ন্ত কী খুব হতাশ হলে? বাঘের বদলে মানুষ! আই অ্যাসিওর ইউ ডার্লিং, এরপর তোমাকে সত্যিকারের মানুষ-খেকো বাঘ মারার চান্স দেব। প্লীজ, রাগ করো না।

আমি গুম হয়ে থেকেছি সারাক্ষণ। এবার বললুম—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

কর্নেল বললেন—সামান্য। এ আমার বরাত জয়ন্ত। যেখানে যাব, খুন আর খুনী এসে আমার ঘাড়ে পড়বেই। এই দেখ না—ম্যান-ইটার মারবো বলে আসর জাঁকিয়ে বসলুম এখানে। অথচ এখানেও সেই খুন আর খুনী!

এই বলে কর্নেল সব হেঁয়ালির সমাধান করলেন। সংক্ষেপে তা বর্ণনা করছি। তিনটি সাইকেলের সঙ্গে একটা খেয়ালী বাঘের সংঘর্ষ থেকেই এই খুনী লোকটার মাথায় মতলব খেলেছিল। সে হতভাগ্য মোড়লের একজন পুরনো শত্রু। জমিজমা নিয়ে বিবাদ ছিল। মামলায় হেরে সে ভূত হয়েছিল। কিন্তু মোড়লকে খুন করার সুযোগ পাচ্ছিল না। কারণ মোড়ল খুন হলেই তার ওপর স্বাভাবিক দায় পড়বে খুনের। সবাই জানে এই শত্রুতার কথা। অতএব সে সাইকেল ও বাঘের সংঘর্ষ থেকে মতলব আঁটল। কিন্তু প্রথমেই মোড়লকে খুন করলে পাছে কেউ কিছু সন্দেহ করে বসে—তাই সে অন্য রাস্তা নিল। এই ধূর্ততার কোনো তুলনা হয় না।

প্রথমে খুন করল এক নিরীহ বুড়িকে। ঠিক বাঘে ধরার মতো চিহ্ন রাখল। ছুরি দিয়ে এমনভাবে খুনটা করল যে বাঘের নখ ও দাঁতের দাগ বলে সবার মনে হবে। মড়ি টেনে নিয়ে যাবার চিহ্নও রাখল। দ্বিতীয়বার খুন করল একই ভঙ্গিতে। তারপর তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য মোড়লকে খুন করতে আর অসুবিধে হলো না। কারণ ততদিনে মানুষ-খেকো বাঘের খবর রটে গেছে। শিকারীরা এসেছে। মাচানে বসেছে। আবহাওয়া তৈরি হয়ে গেছে। অতএব মোড়লকে মারতে আর অসুবিধে নেই।

কিন্তু কর্নেলের চোখ তীক্ষ্ণ। প্রথমেই তিনি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে অবাক হলেন। কোনো মড়ির আশেপাশে বাঘের পায়ের দাগ নেই কেন? মোড়লের মড়িটা তিনি হাতেনাতে দেখলেন, অন্য দুটো দেখার সুযোগ পাননি। মড়ি পরীক্ষা করেই ওঁর সন্দেহ বেড়ে গেল। মাথার খুলি দু-ফাঁক হয়েছে। এটা বাঘের থাবায় হতে পারে না। চুলে রক্ত জমাট হয়ে আছে। কিন্তু বুকে বা পেটে যে সব জায়গায় আঘাত আছে, তার কাছে কোথাও রক্ত নেই। আঘাতের মধ্যেও রক্ত নেই। তার মানে মড়ার ওপর ছুরি চালানো হয়েছে। আর জামা বা ধুতি যেভাবে ঝোপে আটকানো আছে, বাঘ টেনে নিয়ে গেলে অমনভাবে থাকতেই পারে না। সবচেয়ে অদ্ভুত কাণ্ড, মোড়লের লাশের নিচে মাটিতে একটা ফাটল আছে—ফাটলের মধ্যে একটা মোটা হাতুড়ির মাথা কর্নেলের চোখে পড়েছিল। হাতল থেকে খুলেই গিয়েছিল মাথাটা। সম্ভবত খুনীর হাতে হাতুড়িটা ছিল। ওই অবস্থায় টেনে এনেছিল মড়িটা—তারপর কীভাবে খুলে ওখানে ঢুকে যায়। বাঘের মড়ি বলে লাশ কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করেনি। তাই চোখে পড়েনি। কিন্তু কর্নেল তা দেখেছিলেন। তারপর কৌশলে গাঁয়ে রটিয়ে দিয়েছিলেন যে গাঁয়ের কারও একটা হাতুড়ির মাথা হারিয়ে গেছে কিনা। এর ফলে খুনী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং ফাঁদে পা দেয়। সে এসেছিল হাতুড়ির মাথাটা নিয়ে যেতে।......

ছবি : সুফি

Suk—Apr-2

খেজুর রস

অমর রাউত

হাজিগড় গাঁয়ের রসিদ মিঞা খুবই গরীব। নিজস্ব বলতে কাঠা পাঁচেক ধানজমি আর একটুকরো ভিটে ছাড়া কিছুই নেই তার। তাও ঐ জমিতে সব বছর ধান হয় না, সবই আকাশের উপর নির্ভর করতে হয়। যে বছর ভাল বর্ষা হয় সে বছর ধান হয়, খরা হলে হয় অজন্মা। পরের জমিতে মনিষ খেটে সংসার চালায়। একমাত্র মেয়ে হাসিনাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করবে সেই আশায় গতর খাটাতে তার ক্লান্তি নেই। হাসিনার লেখাপড়ায় মাথা ভাল, তাই রসিদ মেয়ের জন্য খরচ করতে কৃপণতা করে না। হরিসভা স্কুলে ফোর-এ পড়ছে হাসিনা, সব বছর ফার্স্ট হয়। স্কুলের কেষ্ট মাস্টারমশাই বলেছেন, রসিদ, হাসিনাকে তুমি আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিও, দেখিয়ে শুনিয়ে দেবোখন। রসিদ রোজ সকালে উঠে মেয়েকে পাঠিয়ে দেয় কেষ্ট মাস্টার-মশাইয়ের বাড়ি।

চার-পাঁচটা ছাগল আছে তাদের, দুধও হয় একটার। কাপখানেক দুধ দুয়ে নিয়ে, জল মিশিয়ে পো'টাক করে খেতে দেয় হাসিনাকে। রসিদ ভাবে ভালমন্দ কিছুই তো খেতে দিতে পারি না মেয়েটাকে, বুদ্ধিটা হবে কি করে? সে বোঝে গাছে সার-খোল না দিলে যেমন গাছ বাড়ে না, ভাল ফল দেয় না, তেমনি বুদ্ধির গোড়ায় সার-খোল অর্থাৎ ঘি-দুধ, ফলমূল খেতে দিতে হবে। ইচ্ছা থাকলেও এতো নগদ পয়সা সে পাবে কোথা থেকে? একটু মাছ দেবার জন্যে ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়ে লম্বা ছিপ নিয়ে অথবা পলুই নিয়ে। ল্যাঠা, পুঁটি, কই, মাগুর যা পায় এনে ফেলে দেয় আমিনা বিবির কাছে, বলে, বেটিকে ভেজে দিস। আর ছাগলগুনো বিধে দিস গাবার ধারে! আমি চলনু বৈঁচিপাতার মাঠে। যেতে যেতে হেঁকে বলে, দেখিস যেন গোঁজ উপড়ে কারো খেতে পড়েনে!

কাস্তে হাতে মাঠের আল ধরে হনহন করে হাঁটতে থাকে রসিদ। রোজই বেলা হয়ে যাচ্ছে তার। একটা চিন্তা তার মাথায় চেপে বসেছে। চোইত মাস পড়লেই হাসিনা গার্লস হাই স্কুলে পড়তে যাবে সেই ধনেখালি, চার মাইল দূর। ফাইভে ভর্তি হবে, টাকা লাগবে অনেকগুলো। সাদা জামা-জুতো-মোজা কিনতে হবে। নতুন বই চাই, একটা পিঠে ঝোলানো ব্যাগ কিনে দিলে ভাল হয়। জামা-জুতো পরে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে হাসিনা যখন হাই স্কুলে যাবে, খুব সুন্দর দেখাবে ওকে, ভেবে মনে মনে অনেক আনন্দ অনুভব করে রসিদ।

নিজের গাঁয়ে কাজ না পেলে ভিন গাঁয়ে গিয়ে 'ফুরনে' ধান কাটে রসিদ।

কাজের আগেই রফা করে নেয়, দশ কাঠা বা এক বিঘে ধান কাটার জন্য কত দেবে মালিক। তারপর কোমরে গামছা বেঁধে শুরু করে ধান কাটা। তার প্রিয় কাস্তেখানা তার রোজগারের হাতিয়ার। সেটা দিয়ে সে শিশিরভেজা সোনাধান কাটতে থাকে মাথা নিচু করে স্নেহময়ী মা-মাটির পানে তাকিয়ে। শীতের রোদেও ঘাম ঝরায় শানিত কাস্তের ঘ্যাসঘ্যাস শব্দ তুলে। সুয্যি ডুবুডুবু হলে, লুঙ্গি নামিয়ে, গামছা গায়ে জড়িয়ে, কাস্তের বাঁট বগলে চেপে ঘরে ফেরে রসিদ।

চোইত মাসের আগে অনেকগুলো টাকা চাই। কিভাবে পাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে মাথায় এলো এই অঘ্রান মাসেই সে খেজুর গাছ বাঁধবে। গাঁ থেকে একটু দূরে 'নাড়ুদহ'—এটা একটা জলাশয়, ওর পাড়ে তো অনেক খেজুর গাছ। চার-পাঁচটা বাঁধলে রস নামবে। পরদিনই কাজ বন্ধ করে, তেজী গাছ দেখে, পাঁচটা খেজুর গাছের পাতা কেটে, গাছ চাঁচল, ছুলে ছুলে রস বেরুনোর উপযোগী করে রাখল। অনেকদিন পর চুল-দাড়ি কাটলে মানুষকে যেমন পরিচ্ছন্ন দেখায়, গাছ-গুলোকেও তেমনি মনে হলো। রসিদ ভাবল পাঁচটা গাছের রস যদি ঠিকমতো নামে, রস বিক্রি করে, গুড় তৈরি করে কিছু পয়সা আসবে।

দু'দিন বাদেই ফুরনে কাজ সেরে, আগে ঘরে ফিরে গাছ-কাঠারিতে শান দিয়ে পাঁচটা নতুন ভাঁড় নিয়ে গেল গাছে লাগাতে। কোমরে দড়ির রিং-এ শরীরের ভার রেখে দু'হাত দিয়ে গাছ-কাঠারি দিয়ে ছুলে গাছের মাথায় 'ভি' আকৃতি করে নিচে কঞ্চির নল পুঁতে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোলা জায়গা রসক্ষরণে জবজবে হয়ে উঠল। রস গড়িয়ে এল নল দিয়ে। নলের প্রান্তে হাঁড়ি বেঁধে, খেজুরের পাতা চিরে হাঁড়িটা বেঁধে দিল।

গাছ থেকে নেমে লুঙ্গি ঝেড়ে, দহের জলে হাত-মুখে ধুয়ে যখন দাঁড়াল, সে শুনতে পেল মসজিদ থেকে আজানের আওয়াজ। গাছতলাতেই গামছা পেতে নামাজ পড়ে নিল রসিদ! দু'হাত পেতে খোদার কাছে দোওয়া মাগল—

আল্লা-মেহেরবান, দুনিয়ার দুখী মানুষদের তুমি কৃপা কোরো!

পরদিন ভোর না হতে মাথায়-কানে গামছা বেঁধে, ছেঁড়া চাদরটা গায়ে জড়িয়ে, ছোট বাঁকটা হাতে নিয়ে গিয়ে হাজির হলো দহের পাড়ে। কি জানি কিরকম রস নেবেছে ভেবে, আল্লা বলে গাছে ওঠে রসিদ। এক হাত দিয়ে গাছ জড়িয়ে এক হাতে খেজুর পাতার বাঁধন খুলে, উঁকি দিয়ে দ্যাখে—রসে হাঁড়ি প্রায় ভর্তি। খুশিতে ভরপুর হয়ে ওঠে সে। হাঁড়িতে বাঁধা দড়ি ধরে গাছের খাঁজে পা রেখে আস্তে আস্তে নেমে এলো নিচে। এমনি করে সব গাছ থেকেই রস-ভর্তি হাঁড়ি নামিয়ে, ছোট বাঁকে ঝুলিয়ে ঘরের পানে হাঁটা দিল। আনন্দের জোয়ার তোলপাড় করতে থাকে তার বুকের ভেতর। বাড়তি উপায়ের এক সম্ভাবনার ইঙ্গিত পায় রসিদ।—আমার হাসি যদি লেখাপড়া শিখে ডাক্তার হয়, নিদেনপক্ষে যদি ইসকুলের দিদিমণিও হয়, তাহলে! বুকের ভেতর ধকধক করে ওঠে।

ঘরে পৌঁছেই হাঁক-ডাক শুরু করে দেয়, ওরে হাসি দেখবি আয়, তোর আম্মাকে ডাক, দেখ কি লিয়েইচি! ছাগলের পা ছেড়ে হাসিনা ছুটে এসে দেখে অবাক। বড় বড় চোখে হাঁড়ির কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, হাই বাপ পাঁচ হাঁড়ি খেজুর রস? ছুটে গিয়ে আম্মার হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে হাঁড়ির কাছে। আমিনা বিবি ছাগলের দুধের বাটি হাতে নিয়ে হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে, রসিদের উদ্দেশে বলে, হ্যাঁগা, দহের পাড়ে বন-ঝোপের মদ্দে গাছগুলানে এত রস লেবেচে?

মাটির বারান্দায় বসে রসিদ বলে, বল তো বিবি, মাস দুই যদি পাঁচ হাঁড়ি করে রস লাবে, আমার হাসি-আম্মার সাদা জামা-জুতো-মোজা-ব্যাগ-লোতুন বই কেনা হবেনি? চোইত মাস থেকে ও হাই ইসকুলে যাবে! হাসিনা বলে, আব্বা, এতো রস কি করবে? রসিদ বলে, আজ তো পোত্থম দিন, আজ খাবো, বিলি করবো! এক ভাঁড় ঘরে রাখ,- খাবো তিনজনে। এক ভাঁড় দুবো কেষ্টো মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে, এক ভাঁড় দুবো পার্থ ঠাকুরের বাড়িতে, তোর ব্যারামের সময় ট্যাকা ধার দেছিলো। এক ভাঁড় দুবো নিলু খুড়োর বাড়িতে, খুড়ো ধান বাড়ি দেয় বর্ষাকালে। বড়-পীরের মাজারে দুবো এক হাঁড়ি। হাসি, তুই পারবি মা, কেষ্টো মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে একটা ভাঁড় লিয়ে যেতে? না, তুই পারবিনি, আমিই বরং বাঁকে গলিয়ে দি আসি চল। এসেই না হয় কাজে বেরুবো।

মেয়ের পিছু পিছু বাঁকে রসের হাঁড়ি নিয়ে আব্বা চলেছে রস বিলি করতে। চৌধুরীপাড়ার ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় টিউবওয়েলের সামনে দাঁত ব্রাশ করছিল ছোকরার দল, চেঁচিয়ে উঠল, ও রসিদ চাচা, ওতে কি রস আছে না কি গো? তা কত করে গ্লাস? শোনো শোনো...রসিদ হেঁকে বলে, আজ দিতে পারবুনি বাবু, কাল-পরশু বাদ দিয়ে আবার আসবো, দিয়ে যাবোখন।

বোসবাড়ির রকে বসে বেশ কয়েকটা চ্যাংড়া হৈ-হৈ করে এসে বাঁক ধরে টানাটানি। রসিদচাচা, এক ভাঁড় অন্তত দিয়ে যাও, দাম যা নাও নেবে! রসিদ বুঝিয়ে বলে, আজ দিতে পারবুনি গো বাবু। পরে আবার আসবো! শিব বোসের ছেলে বাচ্চু পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁগো রসিদচাচা, তা কোথায় গাছ কেটেছো? রসিদ বলে, ঐ যে গো, নাড়ুদহের পাড়ে যে গাছগুলান আছে, সেগুলানই কেটেছি! বাচ্চু বলে, তা কিরকম নাবছে? রসিদ বলে, আজ তো পোত্থম, তা লাবছে ভালুই।

কেষ্ট মাস্টারমশাই হাসিনার পিছনে রসিদকে দেখে বললেন, কিগো রসিদভাই, তোমার বাঁকে ভাঁড় কিসের? রসিদ হেসে বলে, খেজুর রস ইনেছিগো মাস্টারবাবু। বড়-পীরের মাজারে দুবো, আর ভাবনু—আপনাকে এক ভাঁড় না

তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো!

দিয়ে মুখে তুলতে পারবুনি! আপনি আমার হাসিকে বিনে পয়সায় পড়াচ্ছেন! একটা জায়গা দিন, ঢেলে দি!

মাস্টারমশাই বলেন, কতো দাম হয় তুমি নিয়ে যাও! রসিদ জিভ কেটে, হাতজোড় করে বলে, মাফ করবেন মাস্টারবাবু, আপনার কাছে দাম নিতে পারবুনি। রসটা ঢেলে লিন, বরং আবার একদিন জিরেন কাঠের রস দিয়ে যাবো।

সেখান থেকে বেরিয়ে পার্থ ঠাকুর, নিলু খুড়োর বাড়ি রস পৌঁছে দিয়ে প্রায় দৌড়তে থাকে রসিদ বড়পীরের থানে। মাজারের নিচে রস ঢেলে দিয়ে, মাথায় গামছাটা জড়িয়ে, নাক-কান মোলে দোয়া মাগে, আল্লাহ্, দীন-দুনিয়ার মালিক, অনাথ-ফকির মুনিষ্যিদের তুমি দয়া কোরো, বিস্-মোল্লাহি-রহ্মানই-রহিম, আমার আমিনা বিবি আর মেয়ে হাসিনা তোমার খিৎমতে আরামে থাক, আমার গতরে বল দাও, হাতে শক্তি দাও, যেন সারাজীবন কোদাল-কাস্তে চালিয়ে ওদের শাক-ভাত খাওয়াতে পারি! আল্লা মেহেরবান!

চারটে খালি ভাঁড় বাঁকে ঝুলিয়ে দৌড় দিল সে। বেলা অনেক হলো, হাকিমপুরের মাঠে দশ কাঠা জমির ধান কাটা বরাত আছে! ঘরে পৌঁছে কাস্তেখান হাতে নিয়ে হাঁটা দিল মাঠের পানে।

দু'দিন পরে একটু আগে মাঠ থেকে ফিরে স্নান-খাওয়া সেরে, বাঁকে পাঁচটা ভাঁড়, রশি, গাছ-কাঠারি নিয়ে রসিদ চলল দহের পানে। খেজুর গাছগুলো যেন তার অত্যন্ত আপন, নিজের করে ভালবেসে ফেলেছে তাদের। ধূসর মাটির বুকে অবহেলায় বেড়ে ওঠা গাছে প্রকৃতি দিয়েছে বুদ্ধিশ্রেষ্ঠ মানুষের আহার্য। অকৃপণ এই গাছ থেকে বুদ্ধিবলে বের করে নিচ্ছে হাঁড়ি হাঁড়ি সুস্বাদু মিষ্টি রস। গাছের সঙ্গে দড়ি বেঁধে কোমরের ভার রেখে কাঠারি দিয়ে মাথাভর্তি চুলের নিচে দাড়ি কামানোর মতো পাতলা ছাল চেঁছে হাঁড়ি বেঁধে দিল রসিদ।

পরদিন ভোরবেলা গিয়ে পাঁচটা রসভর্তি হাঁড়ি পেড়ে বাঁকে ঝুলিয়ে নিয়ে পৌঁছাল চৌধুরীপাড়ায়। রসের হাঁড়ি দেখে হৈ-হৈ করে ছুটে এলো ছেলে-ছোকরার দল। গ্লাস নয়, পাঁচ টাকা হাঁড়ি দরে তিন হাঁড়ি নিয়ে নিল তিনটে ছেলে। একটু আগিয়ে বোসেদের বাড়ির কাছাকাছি যেতেই বাচ্চু এক হাঁড়ি নিয়ে গিয়ে পাঁচ টাকা এনে দিল। বিজন বোসের ছেলেও

নিল এক হাঁড়ি। বাচ্চু জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁগো রসিদচাচা, দহের পাড়ে গাছগুলো তো জঙ্গলে ভর্তি, ছোট, ওখানে গাছগুলো কাটলে কি করে? রসিদ বলে, কোদাল আর গাছ-কাঠারি দিয়ে সাফ করেছি! বাচ্চু বলে, আবার কবে ভাঁড় বাঁধবে চাচা? রসিদ বলে, আজ বিকেল-বেলা বাঁধবো!

হাঁড়ি খালি করে, ঘরের পানে হাঁটা দিল রসিদ। ভাবতে ভাল লাগছে অল্প খাটনিতে নগদ পঁচিশ টাকা পাওয়া গেল। এইভাবে মাস দুই চালাতে পারলে হাসিনার ভর্তি হওয়ার সব খরচই উঠে আসবে! জোর কদমে হাঁটতে থাকে সে, চেড়া গাঁয়ের মাঠে যেতে হবে তাকে, বিকালে ফিরে গাছে হাঁড়ি দিতে যেতে হবে।

ভোরবেলা বাচ্চু ফুটবল নিয়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। জোর কয়েকবার হুইসেল বাজাল। একে একে হাজির হলো ন্যাড়া, বটু, ভোম্লা, মদনা, বুদো, চণ্ডে। বাচ্চুর চোখ-ইশারায় সবাই দৌড় দিল তার পিছু পিছু। পাটকাঠির গাদা থেকে দুটো পাটকাঠি বের করে নিল বাচ্চু। তারা গিয়ে হাজির হলো দহের পাড়ে। দেরি না করে হাতখানেক পরিমাণ পাটকাঠি ভেঙে নিয়ে কোমরে গুঁজে উঠে গেল খেজুর গাছে। বাচ্চুর দেখাদেখি আরও চারজন চারটে গাছে উঠে পাটকাঠির নল ঢুকিয়ে চোঁ-চোঁ করে রস খেতে লাগল। একজন নামে, একজন ওঠে। এইভাবে পাঁচটা ভাঁড়ের রস শেষ করে দিল।

ভোরের আজান শুনে ঘুম ভাঙে রসিদের। উঠি-উঠি করেও শীতের কাঁথা গায়ে ঢেকে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। উঠে দ্যাখে সুয্যি আসমানের অনেক উঁচুতে। চাদর গায়ে জড়িয়ে, বাঁকটা বগলে নিয়ে চলল দহের পানে। কেলিপুকুরের পাড়ে নিমডাল ভেঙে দাঁতন ঘষতে ঘষতে দেখল দূরে রেললাইন দিয়ে ঘটাঘট শব্দে সেকেন্ড ট্রেন ছুটছে। দহের পাড়ে পৌঁছে জলে নেমে মুখ-হাত ধুয়ে নিল। বিসমল্লা বলে গাছে উঠে খেজুর পাতার বাঁধন খুলে হাঁড়িতে উঁকি দিয়ে দেখে তলানি একটুমাত্র রস পড়ে আছে। পাঁচটা গাছে একই অবস্থা দেখে রাগে-দুঃখে হতাশ হয়ে পড়ল রসিদ। ফাঁকা ভাঁড় গাছতলায় রেখে যখন ভাবছে কি হতে পারে, নজরে পড়ল গাছের তলায় হাতখানেক মাপের পাটকাঠির টুকরো। তার বুঝতে দেরি হলো না, রস চুরি করে খেয়েছে। কে বা কারা চুরি করতে পারে? একটু চিন্তা করেই বুঝে ফেলল, শিব বোসের ছেলে বাচ্চুর দলই এ কাজ করেছে। মন বলল, বাচ্চু, তোমরা বড়লোকের ছেলে, বোঝো না, জঙ্গল সাফ করে একটা গাছকে চেঁছে ছুলে পরিষ্কার করে তা থেকে রস নামানো কত কঠিন! আর রস বিক্রির পয়সা যে আমার কতো দরকার তা তোমরা জানো না। শূন্য হাঁড়ি নিয়ে ফিরতে ফিরতে রাগে জ্বলতে থাকে রসিদ। গরীব তবু কারোর একতিল জিনিস না বলে নিতে বা কারোর সামান্যতম সাহায্য নিতে মানবিকতায় বাধে। এরা পাঁচ হাঁড়ি রসই খেয়ে নিল?

পরদিন ভোরে আজানের আওয়াজ শুনে ঘুম ভাঙে রসিদের। শুনতে পাচ্ছে একটা ছাগল চেঁচাচ্ছে। গাঁয়ের একপ্রান্তে বাড়ি তার, এতো ভোরে কাদের ছাগল হতে পারে? উঠে গিয়ে তারই ছাগলের ঘরের 'আগড়' খুলে দ্যাখে দুটো বাচ্চা হয়েছে। শোবার ঘরের দরজার সামনে এসে ডাকতে থাকে, ও বিবি, ওঠ-ওঠ, ছাগলছ্যানা হয়েচে! ও হাসি, ওঠ-ওঠ! আমিনা বিবি গিয়ে খড় জ্বালিয়ে গরম দিতে লাগল বাচ্চাদের। রসিদ বলে, ন্যাকড়া দিয়ে ওদের গাগুলান পুঁছে দে! আমি চলি দহের ধারে।

সেদিন গিয়েও রসিদ দ্যাখে খেজুর পাতার বাঁধন খোলা, ভাঁড়গুলো কঞ্চির নল থেকে বাইরে সরানো। সে বুঝতে পারল, আজও রস খেয়ে গেছে। রাগে তার মাথা গরম হয়ে উঠল, মনে হলো এই মুহূর্তে প্রতিশোধ নিতে পারলে হয়তো রাগ কমতো। পরমুহূর্তে হতাশায় শক্তিশূন্য হয়ে পড়ল। গাছে উঠে খালি

নিউ বেঙ্গল প্রেসের
কয়েকটি অ্যাডভেঞ্চার ও গোয়েন্দা কাহিনী

রণজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
এলেম নতুন দেশে ১২.০০

রাধারমণ রায়
অদ্ভুত গোয়েন্দা-১ম খণ্ড ১৮.০০
ঐ -২য় খণ্ড ২০.০০

শঙ্কর রুদ্র
ভজগোবিন্দের অ্যাডভেঞ্চার (২য়) ১৮.০০

শচীন দাস
আবিষ্কারের গল্প ২০.০০

শিশিরকুমার মজুমদার
পাতালপুরীর অভিযান ২৫.০০
মামাবাবুর অ্যাডভেঞ্চার ২৫.০০

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
পাণ্ডব গোয়েন্দা (১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড)
(১-৪ — ৩০.০০, ৫,৬—২৮.০০)

সংকর্ষণ রায়
কালনাগিনীর আক্রোশ ১৫.০০
অষ্টভুজা রহস্য ২০.০০

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত
রক্তমাখা গুপ্তধন ২০.০০
সুন্দরবনের শয়তান ২০.০০

সুভাষ ধর
পুলিসের ডায়রী থেকে ৩০.০০

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
☎২৪১ ২২৪৩

ভাঁড়গুলো পেড়ে আনার মতো ক্ষমতা যেন তার আর নেই। কি করবে সে? বাঁক দিয়ে ঝোলানো ভাঁড়গুলো গুঁড়িয়ে দেবে, নাকি কাঠারি দিয়ে রস বেরোনোর জায়গাটা কুপিয়ে কুপিয়ে ঝাঁঝরা করে দেবে? হতাশায় অবসন্ন মনে ভাঁড়গুলো পেড়ে নিয়ে ঘরে ফিরল সে।

নোনাডাঙার মাঠে শানিত কাস্তের ঘ্যাসঘ্যাস আওয়াজে মাথা হেঁট করে ধান কাটছে রসিদ। একমনে কতক্ষণ কাটছে খেয়াল নেই। কাস্তে হাতে আসমানের পানে দু'হাত তুলে চিৎকার করে বলে ওঠে, আল্লা, তুমি কি শুনতে পাও? তবে শোনো, আমি দিনমজুর খেটে খাওয়া মানুষ, কারোর কেড়ে তো খাই না, খুব পরিশ্রম করে সংসার চালাই! খোদা, তুমি কি চাও না আমার হাসি বড়ো হোক? খোদা মেহেরবান তবে আমার উপর এই অবিচার হচ্ছে কেন? হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে রসিদ। নিস্তব্ধ প্রভাতের ফাঁকা মাঠে প্রতিধ্বনিত হলো আ-ল্-লা...আ-ল্-লা...

মাঠ থেকে ফেরার পথে প্রতিশোধের ক্রোধ মনকে বিদ্রোহী করে তুলল তার। রস-চোরদের ধরতেই হবে! কিন্তু কিভাবে? আলের পাশে কাশঝোপ, সেখানে নজর পড়তেই দেখতে পেলো ধুতরো ফুলের গাছ। কয়েকটা ধুতরো ফল কেটে নিলো কাস্তে দিয়ে। বিকালে গাছে হাঁড়ি বেঁধে প্রত্যেক হাঁড়িতে থেঁতো করা ধুতরো ফল ফেলে দিল।

পরদিন খুব ভোরে রাস্তায় বাচ্চুর হুইসেল বেজে উঠল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাজির হয়ে গেল বাচ্চুর দল। পাটকাঠি হাতে সবাই মিলে দৌড়ে গিয়ে হাজির হলো দহের পাড়ে। হিন্দি গান গাইতে গাইতে, যুদ্ধজয়ের ভঙ্গিতে গাছে উঠে প্রাণ ভরে রস খেলো সবাই, পাটকাঠি দিয়ে চুরুক-চুরুক শব্দ তুলে। তলানিটুকুও খেয়ে নিল। কিন্তু এ কি! ফুটবল নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করার আগেই বাচ্চু, মদনা, চণ্ডে সবাই একে অন্যকে বলে, মাথা ঘুরছে কেন? গলা শুকিয়ে আসছে, বমি পাচ্ছে কেন? সবার এক অবস্থা। একজন আর একজনকে ধরাধরি করে কোনোরকমে বাড়ি ফিরল।

বাড়ি ফিরে সবাই অসংলগ্ন কথাবার্তা, অস্বাভাবিক কাজকর্ম করতে লাগল। কেউ জামাকাপড়ে ছারপোকা হয়েছে বলে দেশলাই দিয়ে পোড়াতে যায়। কেউ খাতার পাতা ছিঁড়ে টাকা গোনে দশ-কুড়ি। কেউ বাথরুমে ঢুকে আর বের হতে চায় না। কাউকেই বিছানায় শুইয়ে রাখতে পারছে না বাড়ির লোকে। ভোমলার রসের অ্যাকশান আরম্ভ হয়েছিল একটু দেরিতে। ও-ই একমাত্র এসে বাড়িতে বলতে পেরেছিল তারা সবাই মিলে খেজুর রস চুরি করে খেয়েছে।

কাউকে রিকশায় দু'তিনজন চেপে ধরে, কাউকে ভ্যান রিকশায় শুইয়ে নিয়ে গিয়ে তুলল প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে। গাঁসুদ্ধু হৈ হৈ পড়ে গেল। খেজুর রসে বিষ মেশানোর কাহিনী রঙ চড়িয়ে চাউর হলো চারিদিকে। বাচ্চুর কাকা গাঁয়ের পঞ্চায়েতের সদস্য, বেশ হোমরা-চোমরা লোক। লোকমুখে শুনতে পেল খেজুর রসে বিষ মিশিয়েছে রসিদ মিঞা। মোটর বাইকে চেপে ছুটল থানায়। ডাইরি করল রসিদের নামে। বিষাক্ত খেজুর রস বিক্রির অপরাধে জড়াল তাকে।

একজন সাব-ইনেসপেক্টার দু'জন কনস্টেবলকে মোটর বাইকে চাপিয়ে নিয়ে হাজির হলো হাজিগড় গাঁয়ে। বারোয়ারী-তলায় বাইক রেখে খোঁজ নিয়ে হেঁটে হেঁটে হাজির হলো মাঠের মাঝখানে রসিদ মিঞার বাড়ি। পুলিশ দেখেই সবাই হতভম্ব। বালি দিয়ে কাঠের পাটায় গাছ-কাঠারি শান দিচ্ছিল রসিদ। সাব ইনেসপেক্টার বলল, তুমিই তো রসিদ মিঞা? রসিদ বলে, হাঁ বাবু! পুলিশ বলে, তুমি খেজুর রসে বিষ মিশিয়েছিলে? রসিদ বলে, বিষ লয়গো বাপ, রোজ চুরি করে গাছ থেকে রস খেয়ে যায়, রাগে হাঁড়িতে ধুতরো ফল থেঁতলে দিছিনু! সাব-ইনেসপেক্টার বলে, তুমি জানো, তোমার খেজুর রস খেয়ে ছ'সাত জন ছেলে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে! খেজুর রসে বিষ মেশানোর অপরাধে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো! কনস্টেবল এসে হাতকড়া পরিয়ে দিল রসিদের হাতে। বলল, চলো থানায়।

আমিনা বিবি হাতজোড় করে সাব-ইনেসপেক্টারকে বলল, ওকে ছেড়ে দিন বাবু, ওর জান থাকতে কোনোদিন খেজুর গাছ কাটবেনি! ওকে ছেড়ে দিন। কাঁদতে কাঁদতে আমিনা-হাসিনা আছড়ে পড়ল পুলিশের পায়ে। সাব-ইনেসপেক্টার বলল, পা ছাড়ো, এই ওকে নিয়ে যাও, আমি বাইকে যাচ্ছি! কনস্টেবলরা গাছ-কাঠারিটা হাতে নিল, পায়ে করে ভেঙে দিল রসের হাঁড়িগুলো। হাতকড়া ধরে টানতে টানতে রসিদকে নিয়ে চলল স্টেশনের দিকে। রসিদ কান্নাভাঙা গলায় হেঁকে বলল, হাসিনা মা, মাস্টারবাবুর কাছে পড়তে যাওয়া বন্ধ করিসনি যেন! মা আমিনা, মেয়ে হাসিনা আকাশ বিদীর্ণ করা কান্নায় ভেঙে পড়ল। রসিদ দেখে একটা কাটা ঘুড়ি উড়তে উড়তে এসে পড়ল ধানের মাঠে। তার আগামী দিনের আশা, সবই কাটা ঘুড়ির মতোই হারিয়ে গেল অন্ধকার পৃথিবীর বুকে!

ছবিঃ রাজা চন্দ

গুপ্তধন

পাঁচুগোপাল মণ্ডল

জটাবুড়ির ভিটে বলতে কিছুই ছিল না। আমরা সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছিলাম একটা মাটির ছোট ঢিপি। ঐ ঢিপির পাশে পতিত জমির উপর গ্রামের ছেলেমেয়েরা সকাল-বিকেল খেলাধুলো করত। আমরাও ছোটবেলায় খেলতাম ওখানে।

জটাবুড়িকে আমরা চোখে দেখিনি। ঠাকুরমার মুখে শুনেছি, বুড়ির মাথায় বিশাল জটপাকানো চুল ছিল। বুড়ির তিনকুলে কেউ ছিল না।

একদিন মৃত্যুশয্যায় শায়িত পাড়ার বিপিন ঠাকুরদার মুখে শুনলাম ঐ জটাবুড়ির ভিটের মধ্যে গুপ্তধন আছে। কিছুটা সন্দেহ হওয়ায় তখন বলেছিলাম, ঠাকুরদা, তুমি এতদিন পরে এমন খবর আমাকে দিলে। অথচ তুমি নিজে জানা সত্ত্বেও ঐ গুপ্তধনের সন্ধান করোনি কেন?

ঠাকুরদার বয়স তখন নব্বই পার হয়ে গেছে। আমার কথা শুনে ঠাকুরদা ক্ষীণ স্বরে বলেছিল, গুপ্তধন খুঁজেছিলাম ভাই, পাইনি। আমার দিন ঘনিয়ে আসছে। যে কোনো সময় আমি মরে যাব। তাই তোকে বলে গেলাম ঐ গুপ্তধনের কথা।

তারপর একটু থেমে দম নিয়ে বলেছিল, আমি জানি তুই সৎ, গ্রামের জন্যে তুই ভাবিস। গ্রামের ছেলেরাও তোর কথায় চলাফেরা করে। চিন্তা করে দেখলাম তুই পারিস এতদিন পর, ঐ গুপ্তধনের সন্ধান করতে।

বললাম, ঠাকুরদা, তোমার শরীর ভাল নয়। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই তোমার সব কথা শুনব।

না ভাই, একটু বোস আমার কাছে, আমি আর বলার সুযোগ পাবো না হয়তো। শোন, অনেককাল আগের কথা। আমার বয়স তখন পঁচিশ-তিরিশের বেশি নয়। বয়স কম হলেও আমি ছিলাম গ্রামের মাতব্বর। সেবার কলেরা হলো গ্রামে। তখন ভাল ওষুধ ছিল না। কে কার মুখে জল দেয় এমন অবস্থা। ঠিক এমন সময় জটাবুড়ি আমাকে দেখতে চেয়ে খবর দিল। গিয়ে দেখি, বুড়ি ভেদবমির উপর শুয়ে আছে অন্ধকার ঘরের মধ্যে। বুড়ির তখন বয়স একশো ছুঁই-ছুঁই বোধহয়। চোখে দেখতে পায় না, কানে শুনতে পায় কোনোরকমে। বুঝলাম বুড়ির শেষ সময় উপস্থিত। সে কি বলতে চায় শোনার চেষ্টা করলাম।

বুড়ি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, বিপিন, তুই এসেছিস, আয় কাছে আয়। একটা কথা বলে যাই। আমি মরে গেলে কেউ জানবে না সে কথা। শোন, তিন ঘড়া মোহর আমি পুঁতে রেখেছি।

বুড়ির কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। বুড়ি বলে চলল, আমার ভিটের মধ্যে কোথায় তা আছে আজ মনে নাই। অনেক দিন হয়ে গেছে। তখন আমার বয়স এক কুড়ির কিছু কম-বেশি হবে। এক ডাকাতসর্দার নবাববাড়ি লুট করে একদিন রাতের বেলা ঐ গুপ্তধন আমার কাছে গচ্ছিত রেখে যায়। সেই সর্দার আর এমুখো হয়নি। অনেক অভাবেও নিজের জন্যে একটা মোহরও সাহস করে খরচ করিনি রে। রাতের বেলা পুঁতে রেখেছিলাম সব।

পুরনো দিনের স্মৃতি স্মরণ করতে করতে ঠাকুরদার ঘোলা চোখ দুটো অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে চকচক করে উঠছিল। বললাম, জটাবুড়ি তারপর মরে গেল?

মাথার কাছে রাখা ঢাকা গ্লাস থেকে একটু জল খেয়ে ঠাকুরদা বলল, বুড়ি আর কথা বলতে পারেনি ভাই। জটাবুড়ির কথা বিশ্বাস করে মাস তিনেক পরে বুড়ির ভিটেতে রাতের পর রাত শাবল আর কোদাল দিয়ে অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করেছিলাম। গুপ্তধন পাইনি। পাবো কি করে বল? আমি তো লোভী! সাক্ষী রাখতে চাইনি। একা যেতাম। আজ পর্যন্ত কাউকে বলিনি এই গুপ্তধনের কথা। পারলে তুই খোঁজ করিস ভাই।

দু'তিন দিন পরে মারা গিয়েছিল বিপিন ঠাকুরদা। তারপর কেটে গেল কয়েক মাস। এক সকালে গ্রামের জনা কুড়ি ছেলেকে নিয়ে জটাবুড়ির ভিটেয় মাটি তোলার কাজ শুরু করলাম। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল একটা পুকুর খনন করা। দিন দশেক মাটি তোলার পর ঢিপির পাশের জমি থেকে সত্যি সত্যি পাওয়া গেল সারি সারি তিন ঘড়া মোহর। সবই নবাবী আমলের।

বুঝলাম, প্রায় দেড়শো বছর আগে পুঁতে রাখা এই গুপ্তধন। সেই ধনসম্পদ আমি পাবো আশা করিনি। ছেলেদের বললাম, তোমরা এ মোহর ব্যক্তিগতভাবে কেউ নেবে না।

গ্রামে হৈচৈ পড়ে গেল। জটাবুড়ির স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে পুকুর খনন হলো, হলো স্নানের ঘাট। পুকুরের পাশে গড়া হলো ছেলেদের খেলার জন্য পার্ক। সেই পার্কের মধ্যে জটাবুড়ির নামে স্মৃতিফলক বসানো হয়েছে। আমাদের গ্রামে গেলে সে সব দেখতে পাওয়া যাবে আজও!

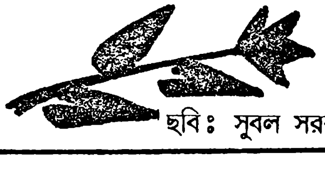

ছবিঃ সুবল সরকার

গল্প হলেও সত্যি

তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

*[ইংরেজিতে বলে টার্নিং পয়েন্ট। বাংলায় সন্ধিকাল অর্থাৎ মানুষের জীবনের মোড় ঘুরে যাবার মুহূর্ত। কোন দিকে ঘুরছে? মানুষকে ভালোবাসার দিকে, মানুষের সেবা করার দিকে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'শিবজ্ঞানে জীবে সেবা' করো। স্বামী বিবেকানন্দ তাকেই প্রায়োগিক আকার দিয়ে বললেন, 'ব্যবহারিক বেদান্ত'। আমরা অহরহ তার উদাহরণ চোখের সামনে দেখতে পেলেও মনে রাখি না। কিন্তু সেসব ঘটনা ও দৃষ্টান্ত থেকে যায় আমাদের চিন্তার আড়ালে। ঘটনাগুলো গল্পের মতো হলেও সত্যি। সেই রকমই কিছু ঘটনা তুলে ধরা হচ্ছে **গল্প হলেও সত্যি** শিরোনামে। কখনো কোনো সাধু বা সাধিকা কিংবা সাধারণ মানুষ অথবা বাহাদুরের মতো কোনো অনাথ বালকের জীবনের ঘটনাগুলি সাধারণ হলেও অসাধারণ হয়ে অনেক মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ভবিষ্যতেও দেবে।]*

সিস্টার ও খোকা

সে এক দুর্যোগের ক্ষণ। কলকাতা থেকে কাতারে কাতারে লোক পালাচ্ছে নানা জায়গায়। কাগজে বড় করে লেখা বেরিয়েছে—'কলকাতায় প্লেগ মহামারী'! এই মারাত্মক রোগ বম্বে-দিল্লী হয়ে এবার এসেছে কলকাতায়। লোকও মরছে শয়ে শয়ে। তাই আর কেউই কলকাতায় থাকতে রাজী নয়।

বাগবাজারে বাগদী-বস্তিতেও প্লেগ এসে ঢুকেছে। বেশ কয়েকটি বাড়ি থেকে মারা যাওয়ার সংবাদ পেয়েছেন সিস্টার। যেখানেই প্লেগের কথা শোনেন, সিস্টার সেখানেই দৌড়ান। শহরের আবর্জনার স্তূপ সাফাইয়ের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। দলের একজন এসে জানাল যে খালের ধারে ভূষণ বাগদীর বস্তির ঘরে তার পাঁচ বছরের ছেলেটা প্লেগে আক্রান্ত হয়েছে। সহকর্মীদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে সিস্টার দৌড়ালেন ভূষণের বাড়ির দিকে।

ভূষণের স্ত্রী সিস্টারকে চেনে। বাগবাজারের পল্লীতে পল্লীতে আবর্জনা পরিষ্কার করতে দেখেছে। যতই দেখেছে ততই সে অবাক হয়ে গেছে। এমন লক্ষ্মীর মতো চেহারা, যেন সাক্ষাৎ দেবী। অথচ কী অমায়িক ব্যবহার! সিস্টারকে দেখে ভূষণের স্ত্রী তাড়াতাড়ি একটা তালপাতার চাটাই পেতে দিল বসতে। সিস্টারের সেদিকে লক্ষ্য নেই। তিনি জানতে চান, খোকা কোথায়? ভূষণের স্ত্রী তাঁকে খোকার কাছে নিয়ে গেলে, সিস্টার খোকাকে কোলে তুলে তার গা মুছিয়ে দিলেন, ওষুধ খাওয়ালেন, সেই সঙ্গে একটু লেবুর জুস। সিস্টারের ব্যবস্থামতো ডাক্তারবাবু (ডাক্তার আর. জি. কর) খোকাকে দেখতে এলেন বিকেলে। তিনি রোগীর ওষুধ বদলে দিলেন এবং বলে গেলেন সিস্টার যদি ওই পরিবেশে থাকেন তাহলে তাঁরও প্লেগ হতে পারে।

কোনো কিছুতেই সিস্টারের কান নেই। ডাক্তার চলে গেলে তিনি নিজেই চুন কিনে এনে জলে ভিজিয়ে ভূষণের ঘরের দেওয়াল চুনকাম করতে থাকেন। কিছু জীবাণুনাশক পাউডারও কিনে এনেছিলেন চুনের সঙ্গে। তাই ছিটিয়ে দিলেন ভূষণের বাড়ির চারপাশে।

দেখতে দেখতে রাত নামল। ভূষণের রুগ্ন শিশু রোগের ঝোঁকে বারবার 'মা, মা' বলে সিস্টারকে জড়িয়ে ধরছে। সিস্টার খোকাকে নিয়মমতো ওষুধ খাওয়ান, ঠিকঠাক পথ্য দেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় জ্বর দেখেন, রোগীর মাথায় জলপট্টি লাগান আর সর্বক্ষণ বাতাস করে চলেন।

রাত কেটে সকাল হলো। রোদ এসে পড়েছে ভূষণের জীর্ণ কুটীরে। সিস্টার দেখলেন খোকা পিটপিট করে তাকিয়ে রয়েছে তাঁর দিকে। সে জল খেতে চাইল। সিস্টার খোকার মুখে একটু মিছরির জল দিলেন। তার মুখ-চোখের অবস্থা আশ্বস্ত করল তাঁকে। ভাবলেন, হয়তো জ্বরটা থমকে দাঁড়িয়েছে। এবার খোকা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবে। সিস্টার প্রাণপণ চেষ্টায় তাকে সারিয়ে তুলতে চাইলেন। খোকাও যেন তার আপন মাকে ভুলে গেছে। সে মুহূর্তের জন্যও সিস্টারকে চোখের আড়ালে রাখতে নারাজ। সিস্টার ঘরের বাইরে গেলেই, খোকা 'মা মা' বলে চিৎকার করে।

সিস্টার ছুটে আসেন খোকার কাছে। তাঁর আর বাড়ি ফেরা হয় না। কোনো-রকমে একটু শুকনো খাবার খেয়ে নিয়ে বসে থাকেন খোকার বিছানার পাশে।

খোকা সারাদিন ভালোই ছিল। কিন্তু রাতে আবার জ্বর বাড়তে শুরু করল। সিস্টার ওষুধ দেন, জলপট্টি লাগান, বাতাস করেন। তবু জ্বর কমে না। ভোর হতে না হতেই সিস্টার ভূষণকে পাঠালেন ডাক্তার ডাকতে।

খোকা অস্থিরভাবে ছটফট করছে। সিস্টার খোকাকে কোলে তুলে নিলেন। তিনি দেখলেন, খোকার চোখগুলো হঠাৎ কেমন সিঁদুরের মতো লাল হয়ে গেছে। খোকা জল চাইল। সিস্টার তাড়াতাড়ি তার মুখে জল দিলেন। কিন্তু সে জল আর গলা দিয়ে নামল না। ঠোঁটের দু'কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

সিস্টার তাকে নাড়া দিতে দিতে আকুল হয়ে ডাকতে লাগলেন, খোকা...খোকা... কে সাড়া দেবে? খোকার নাড়ীর স্পন্দন ততক্ষণে থেমে গেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ভূষণ ঘরে ঢুকল। দেখল সিস্টারের দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। খোকা তখনও তাঁর একটা হাত জড়িয়ে ধরে আছে।

তথ্যসূত্রঃ ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

উপহার

ডঃ গৌরী দে

ডাক্তারদের জীবনটাই এমনি। রোগ-রোগী নিয়ে কঠিন বাস্তবের সঙ্গে লড়তে লড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। আর তখনই মনে হয় ক'দিনের জন্যে কোথাও বেড়িয়ে এলে হয় না? ঠিক এই চিন্তাটাই মনে এলো ডাঃ সুরজিৎ সরকারের। ভাবলেন জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে কোথাও যাওয়া যাক। কিন্তু যাবেন কোথায়? বেশিদিন তো হাসপাতাল থেকে দূরে থাকা যাবে না। নিজের চেম্বারে বসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে এটাই চিন্তা করছিলেন, এমন সময় ফোন বেজে উঠল।

হ্যালো বলতেই ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল, দাদা, আমি বুনি বলছি, কেমন আছ?

বুনি? সুরজিতের একমাত্র আদরের ছোট বোন। আজ তিন বছর হলো বিয়ে হয়েছে অথচ একদিনও তার কাছে যাবার সুযোগ হয়ে ওঠেনি তাঁর। কারণ বুনির বিয়ে হয়েছে নবাবগঞ্জে। বর্ধমান স্টেশনে নেমে গাড়ি বা রিকশায় আরও চার মাইল ভেতরে। সুতরাং এতদূরে যাবার মতো অফুরন্ত সময় ডাক্তার সরকার কোনোদিনই পান না। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে তাঁর সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বুনির গলা শুনেই ঠিক করে ফেললেন, ওর কাছেই যাবেন ক'দিনের জন্যে। বুনিও খুশি হবে আর তাঁরও বেড়ানো হবে।

সুরজিৎ খুব উৎসাহিত হয়ে বলেন, বুনি, তুই ফোন করেছিস ভাল হয়েছে, পরশুদিন আমি তোদের কাছে যাচ্ছি। তিন দিন থাকবো। কি? খুশি তো?

কি বলছো দাদা! আনন্দে ঝলমল করে ওঠে বুনির কণ্ঠস্বর। এতদিন এতবার বলেও হয়নি, আর আজ মেঘ না চাইতেই জল?

হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠেন সুরজিৎ। বলেন, এবার বল, বর্ধমানে নেমে ঠিক কিভাবে যাব তোদের বাড়ি। সেই তিন বছর আগে একবার গিয়েছিলাম তো, পথ-ঘাট তত মনে নেই।

বুনি বলল, তুমি কিচ্ছু ভেবো না দাদা। আমার সাদা রঙের অ্যামবাসাডার থাকবে তোমার জন্যে। তুমি শুধু বল কটার ট্রেনে আসছো।

কলকাতা থেকে তো সামান্য পথ। ধরে নে বিকেল পাঁচটার মধ্যে পৌঁছে যাব। সকালে হাসপাতালটা সেরে নেব।

ঠিক আছে তুমি তাহলে সাবধানে এসো। এখন রাখছি।

হঠাৎ কি মনে হওয়ায় সুরজিৎ বলে ওঠেন, দাঁড়া বুনি, তোর শ্বশুরের নামটা যেন কি? বাড়ির ঠিকানাটা ঠিকমতো জানা থাকা ভাল।

খিলখিল করে একটা হাসির শব্দ। বুনি বলল, অত চিন্তা কোরো না তো দাদা। ঘোষপাড়ার ঘোষেদের বাড়ি দেখে সম্বন্ধ করে বিয়ে দিলে আর ঠিকানা ভুলে গেলে! লোকে কি বলবে গো!

সুরজিৎ সত্যিই মনে মনে লজ্জিত হলেন। নিজের বোনের বাড়ির ঠিকানা কেউ ভোলে? আসলে অনেকক্ষণ ধরে ফোনে কথা বলছেন তো, সামনে বেশ ভিড় হয়ে গেছে, ঐদিকে তাকিয়ে তিনি হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন।

বিকেল পাঁচটা নয়—প্রায় সন্ধ্যে সাড়ে ছটা নাগাদ বর্ধমান গিয়ে পৌঁছলেন সুরজিৎ। স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখলেন কতকগুলো সাইকেল রিকশা ছাড়া আর কিছু নেই। ভাবলেন বুনির গাড়ি বোধহয়

অপেক্ষা করে চলে গেছে। তিনি একটা সাইকেল রিকশায় উঠে বললেন, চল তো ঘোষপাড়ায় ঘোষেদের বাড়ি।

রিকশাওলা তখনও সাইকেলের ওপর বসেনি—এমন সময় সুরজিৎ দেখলেন একটা সাদা অ্যামবাসাডার, দরজায় নীল কাচ তোলা এসে দাঁড়াল। রিকশাওলাকে সুরজিৎ বললেন, দাঁড়াও তো বাবা দেখি, আমার গাড়ি এলো কিনা।

রিকশাওলা চট করে বলে ওঠে, না বাবু, ওটা আপনার গাড়ি নয়। আপনি যাবেন না।

আমার নয় বললেই হলো, তুমি জান? আমার বোন বলেছে সাদা গাড়ি আসবে আমাকে নিয়ে যেতে।

রিকশাওলার কথা না শুনে সুরজিৎ এগিয়ে গেলেন গাড়ির কাছে। চালকের দিকের কাচটা পুরোপুরি তোলা নয়। অল্প ফাঁক আছে। আসনে বসে আছে ড্রাইভার। সুরজিৎ বিরক্ত হলেন। লোকটা কি? নেমে দেখবে তো! এইসব আজকালকার ড্রাইভার। বিরক্ত হয়ে সুরজিৎ ফাঁকের মধ্যে দিয়ে বললেন, আমি ডাঃ সুরজিৎ সরকার, তুমি আমাকে খুঁজছ তো?

গাড়ির কাচটা একটু নেমে গেল। অন্ধকারে ড্রাইভারের মুখ দেখা গেল না ভাল করে। সে বলল, আপনি ডাক্তারবাবু? দেখুন আমি একজন ডাক্তারবাবুর জন্যেই এখানে অপেক্ষা করছি। আমাদের কর্তার খুব অসুখ। লোক গেছে কলকাতা থেকে ডাক্তার আনতে। কিন্তু এখনও এসে পৌঁছয়নি। আপনি যদি কষ্ট করে একবার দেখতে যান তারপর আপনি যেখানে বলবেন আপনাকে পৌঁছে দেব।

সুরজিৎ একটু ভাবলেন। মানুষ সুরজিতের মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠল ডাক্তার সুরজিৎ। ভাবলেন যাবার পথে রোগী দেখে গেলে কি আর এমন দেরি হবে! তাছাড়া রিকশায় যাওয়ার থেকে গাড়িতে যাওয়া অনেক সেফ। সুরজিৎ রিকশায় ফিরে এলেন। জিনিসপত্র নিয়ে রিকশাওলাকে কিছু পয়সা দিতে গেলেন। রিকশাওলা নিল না। শুধু আর একবার ফিসফিস করে বলল, ও গাড়িতে না গেলেই ভাল হতো।

সুরজিৎ গ্রাহ্য করলেন না। ডাক্তারী ব্যাগটা অভ্যেসবশে সঙ্গে এনেছিলেন। সেটা আর জামাকাপড়ের সুটকেসটা রিকশা থেকে উঠিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলেন সাদা অ্যামবাসাডারের দিকে। নিমেষের মধ্যে যেন গাড়িটা উড়ে একটা বাড়ির সামনে এসে থেমে গেল। না, বাড়ি নয়—বিশাল অট্টালিকা। উর্দিপরা বেয়ারা সুরজিৎকে নিয়ে চলল উঠোন-দালান পেরিয়ে একটা ঘরের দিকে। ঘরটাও বিশাল। মাঝখানে বিরাট মেহগিনি কাঠের পালঙ্ক পাতা। কাঠের কাজ করা উঁচু উঁচু আলমারি, পাথরের টেবিল, স্ট্যাচু বলে দিচ্ছে কোনো জমিদার বা রাজা-রাজড়ার ঘর। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক বৃদ্ধ। সুরজিৎকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, আমি নায়েব। ইনি রায়বাহাদুর প্রতাপ নারায়ণ চৌধুরী, হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

সুরজিৎ দেখলেন সত্যিই কর্তাবাবু খুবই অসুস্থ। জ্বর প্রায় একশো ছয় ডিগ্রি—অজ্ঞান অচৈতন্য। সুরজিৎ সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ থেকে ইনজেকশন বার করে কাজ শুরু করলেন। বাড়ির মেয়েদের সরে যেতে বললেন। তারপর নায়েবের সাহায্যে মণ-মণ বরফ এনে বিছিয়ে দিলেন মাটিতে। তার ওপর রোগীকে শুইয়ে বরফস্নান করাতে লাগলেন। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে জ্বর আয়ত্তের মধ্যে এলো। এবার শুরু হলো অন্যভাবে চিকিৎসা।

কর্তাবাবু যখন সুস্থ হয়ে চোখ মেলে তাকালেন তখন রাত ভোর হয়ে গেছে। বড় গ্র্যান্ড ফাদার ক্লকে ঢং ঢং করে চারটে বাজল। কর্তাবাবু কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে বললেন, ফি দিয়ে আপনাকে ছোট করবো না। তবে আমি যা দেব তা আমার সামান্য উপহার বলে নিতে হবে। কর্তাবাবুর নির্দেশে নায়েব একটা ছোট্ট প্যাকেট এনে সুরজিতের হাতে দিলেন। সুরজিৎ তখন ক্লান্ত অবসন্ন, যা দিয়েছে সেটা ব্যাগে পুরে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ওষুধটা চলবে, কাল সন্ধ্যেবেলা একবার এসে রিপোর্ট দিয়ে যাবেন—ঘোষপাড়া ঘোষবাড়ি।

ভোর তখন পাঁচটা। বুনিদের বাড়ির সামনে গাড়িটা সুরজিৎকে নামিয়ে দিয়ে গেছে। দরজায় কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিল বুনির স্বামী দেবজিৎ। অবাক হয়ে বলে, একি দাদা, আপনি এই সময়! কাল তিনবার আমার গাড়ি গেছে—আপনাকে পায়নি।

সুরজিৎ তখন ক্লান্ত। বললেন, ঘরে চল সব বলছি।

সব শুনে দেবজিৎ আর বুনি চুপ। কারো মুখে কথা নেই। সুরজিৎ বলেই চলেছেন, দেখো সন্ধ্যেবেলা ওরা আসবে রিপোর্ট দিতে। যদি দরকার হয় একবার যাব।

না দাদা, তুমি যেতে পারবে না।

বুনির গম্ভীর গলা শুনে চমকে উঠলেন সুরজিৎ। বললেন, সেকি রে? আমি যে ডাক্তার—

ওঁকে চুপ করিয়ে দিয়ে বুনি বলল, তুমি যা বললে তা কেউ বিশ্বাস করবে না। কারণ ও বাড়িতে আজ দশ বছর হলো কেউ থাকে না। সকলে ওটা পোড়ো বাড়ি বলেই জানে। ওখানে যারা ছিল বহুদিন আগেই মারা গেছে।

কি বলছিস এসব! সব মিথ্যে! তাহলে এটা কি? সুরজিৎ ব্যাগ থেকে সেই প্যাকেটটা বার করলেন। মোড়ক খুললেন, দেখা গেল ভেলভেটের কৌটোয় একটা গিনি। সুরজিতের হাতে গিনিটা জ্বলজ্বল করতে লাগল। ঘরের মধ্যে তখন একটা পিন পড়লেও শব্দ হতো।

ছবিঃ রঞ্জন দত্ত

স্বাগত নতুন সহস্রাব্দ

ফিরে দেখা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি

আজ থেকে মাত্র ৯৬ বছর আগের কথা।

বাংলা মায়ের কিছু দামাল ছেলে কেড়ে নিয়েছে ভারত শাসক বৃটিশদের রাতের ঘুম। তাঁরা সন্ত্রস্ত, তাঁরা ভীত। ঐ পাগল ছেলেদের না হয় নিজেদের প্রাণের ভয় নেই, তাঁদের তো আছে। তাঁদের মাথায় তখন ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে সরিয়ে ফেলার চিন্তা। অন্যদিকে তাঁদের জিদ অগ্নিযুগের ঐ দামাল ছেলেগুলোকে মুছে ফেলার। কিন্তু ক'জনকে মারবেন তাঁরা? এরা যে রক্তবীজের বংশ, বাংলা মায়ের বীর সন্তান।

তখন আলিপুরের জেলে মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় দিন গুনছেন অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ) আর তাঁর বিপ্লবী মন্ত্রশিষ্যরা। আদালতে বিচার চলছে। বন্দীরা লোহার খাঁচায়। চোখ-মুখ উদ্ভাসিত তাঁদের, ফাঁসির দড়ি সামনে ঝুলছে তবু তাঁরা নির্বিকার। তাই ভরা আদালতে হাতের লোহার শৃঙ্খল বাজিয়ে উল্লাসকর দত্ত গান গেয়ে ওঠেন, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

ধরা পড়েছে তো মাত্র এরা ক'জন। আরও কতজন আছে কে জানে! শত অত্যাচারেও কারো মুখ থেকে একজনেরও নাম বের করতে পারছে না ইংরেজ প্রভুর দাসরা। রামসদয় ছিলেন ঐ দাসদেরই একজন। বড় বিশ্বস্ত গোলাম তিনি। কাজ করতেন স্পেশাল ব্রাঞ্চে। তিনি ফন্দী আঁটলেন বিপ্লবীদের পেট থেকে গোপন কথা টেনে বের করার। ভয় দেখিয়ে এদের কব্জা করা যাবে না। এদের কাছে অভিনয় করতে হবে, ভাব করতে হবে তিনি যেন ওদের পরমহিতৈষী। ওদেরই আদর্শে বিশ্বাসী। পেটের দায়ে ইংরেজের গোলামী করছেন এই যা। পারলে তিনিও ওদের মতো স্বাধীনতার যজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। উপায় যে নেই, অনেকগুলো মানুষ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

তিনি পরমহিতৈষীর মতো বন্দীদের আলাদা আলাদা কখনো আবার ছোট ছোট দলে ভাগ করে নিয়ে বোঝাতে লাগলেন। বললেন, তোমাদের এই কাঁচা বয়েস, কেন মিছিমিছি ফাঁসির দড়ি গলায় পরবে। বলে ফেলো, বলে ফেলো—যে যা করেছো, কার নির্দেশে করেছো সব বলে দাও, আমি কথা দিচ্ছি, কিচ্ছু হবে না তোমাদের। ছাড়া পাবে, চাকরি পাবে। সুখে সংসার করবে। সব ব্যবস্থা করে দেবো আমি। কথা দিচ্ছি, যারা আমার কথা শুনবে তাদের গায়ে আঁচও লাগবে না।

বারবার বুঝিয়েও সুবিধে করতে পারেন না রামসদয়বাবু। তিনি অবাক হন, এতগুলো ছেলে, কাঁচা বয়েস, সামনে ফাঁসির দড়ি তবু কেউ মুখ খুলছে না। কেউ রাজসাক্ষী হবে না, অ্যাপ্রুভার হয়ে বাঁচতে চায় না। তিনি বিশ্বাসই করতে পারেন না, জাতটার চরিত্র কী রাতারাতি বদলে গেল? কিন্তু হাল ছাড়েন না। একটা ছেলের মতিগতি তাঁকে খুশি করে। তাঁর আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে। ভাবেন, ঐ ছেলেটাকে বোধহয় শেষ পর্যন্ত অ্যাপ্রুভার করা যাবে। গোপন সোর্সও সেই কথাই

জানিয়েছে। ছেলেটাকে বাজিয়ে দেখতে হবে আলাদা ভাবে। এমন ভাবে কাজটা করবেন যাতে কাকপক্ষীও না টের পায়। রামসদয়বাবু বুঝতে পারেননি, তিনি ডালে ডালে চললে কী হবে বাংলার বিপ্লবীরা চলেন পাতায় পাতায়। পুলিশের মধ্যেও এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন, বিপ্লবীরা তাঁদের আপনজন।

তাই আদালতে যাওয়া-আসার পথে তাঁদের কানে কথাটা আসতে লাগলো। তাঁদেরই একজন নরেন গোঁসাই নাকি অ্যাপ্রুভার হয়েছে। প্রথমটায় কেউ বিশ্বাস করেননি, ভেবেছিলেন এও বুঝি পুলিশের একটা চাল। এইভাবে তাঁদের আত্মবিশ্বাস টলিয়ে দিতে চায় বৃটিশের কেনা গোলামরা।

সেদিন জেলে আইডেনটিফিকেশন প্যারেডে অরবিন্দ ঘোষের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে নরেন গোঁসাই। ধারে কাছে পুলিশের কেউ নেই দেখে অরবিন্দ চাপা গলায় বললেন, নরেন, এসব কী কথা কানে আসছে?

কী কথা দাদা?

তুমি নাকি রামসদয় মানে পুলিশের সঙ্গে কী সব বন্দোবস্ত করেছো?

নরেন চমকে ওঠে না। তার মুখে বিস্ময়ের ছাপও পড়ে না। নির্বিকারভাবে বলে, কী বলবো দাদা, পুলিশের লোকরা রাতদিন আমায় জ্বালাতন করে মারছে। আমায় নাকি ওদের অ্যাপ্রুভার হতে হবে।

তুমি তাদের কী উত্তর দিয়েছো?

আমি কী জানি যে ওদের জানাবো। তবু ওরা বিশ্বাস করছে না। খালি খবরের জন্যে আমার কাছে আসছে।

অরবিন্দ হাসলেন। বললেন, পুলিশের লোক এবার যখন তোমার কাছে আসবে তখন তাদের বোলো, স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার আমাদের গুপ্তসমিতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বুঝেছো।

নরেন হেসে বলে, আমি সেইরকমই একটা খবর দিয়েছি। পুলিশকে বলেছি, সুরেন ব্যানার্জি আমাদের হেড ছিলেন।

অরবিন্দ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বুঝলেন, ব্যাপারটা হাল্কাভাবে নেবার নয়। তাই ধমক দিয়ে বললেন, একথা বলার কোনো দরকার কী তোমার ছিল?

অরবিন্দ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন নরেনের দিকে। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে থতমত খেয়ে যায় নরেন। বলে, ইচ্ছে করে বলেছি, ঘুরে মরুক না পুলিশ।

অরবিন্দ আর কিছু বললেন না। যা বোঝার তিনি বুঝে গেছেন। এই অপদার্থটাই তাঁদের ফাঁসাবে। বাংলার ছেলেদের মধ্যে যে নব জাগরণ এসেছে, বিপ্লবী মন্ত্রে তারা যে দলে দলে দীক্ষা নিচ্ছে, এর জন্যেই তা হয়তো ব্যর্থ হবে। অন্য বন্দীরাও ব্যাপারটা জেনে গেল। তারা বুঝলো, বোকা সেজে নরেন গোঁসাই তাদের প্রতারিত করছে। একদিন রাগের মাথায় একজন বন্দী নরেনকে লাথি মেরে বসলো। পুলিশ বুঝলো, এরা নির্ঘাৎ কিছু আঁচ পেয়েছে। এদের মধ্যে নরেনকে রাখা আর নিরাপদ নয়। তাকে নিয়ে গিয়ে রাখা হলো ইউরোপীয় কয়েদীদের হাসপাতালে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে। সেই সঙ্গে আদালতে বন্দীদের সামনেই পুলিশ জানিয়ে দিলো, বিপ্লবী-বন্দীদের এক সঙ্গী নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হয়েছে।

বন্দী বিপ্লবীরা চিন্তিত হয়ে উঠলেন। নিজেদের জন্য নয়, তাঁরা জানেন, ফাঁসির দড়ি সামনেই ঝুলছে। সে জন্যে খুশি তাঁরা। তাঁরা বিশ্বাস করেন, একজন করে ফাঁসির দড়িতে ঝুলবেন আর শত শত তরুণ, যুবক এগিয়ে আসবে বিপ্লবী মন্ত্র গ্রহণ করে দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়াতে। মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে। কিন্তু নরেন যদি সব ফাঁস করে দেয় তাহলে জেলের বাইরে যাঁরা আছেন তাঁদের যে সমূহ বিপদ হবে। বিপ্লব-আন্দোলন পিছিয়ে পড়বে।

জেলের মধ্যেই পরামর্শ সভা বসলো। সেই সভায় সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, সময় নষ্ট না করে জেলের মধ্যেই নরেন গোঁসাইকে হত্যা করতে হবে। এছাড়া তার মুখ বন্ধ করার আর কোনো উপায় নেই।

বিপ্লবীদের নেতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ আপত্তি জানালেন। বললেন, তাহলে আমার সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে।

কিসের পরিকল্পনা? কানাইলাল জিজ্ঞেস করলো। শ্যামবর্ণ তরুণ কানাইলালের চোখে চশমা। চুপচাপ থাকতেই সে ভালোবাসে।

কেন, তোমাদের তো বলেছি, আমরা জেল ভেঙে পালাবো। সেই জন্যে দুটো রিভলভারও যোগাড় করে ফেলেছি। জেলের মধ্যে যদি নরেনকে হত্যা করা হয় তাহলে সে পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। তা ছাড়া...

বারীন্দ্রকুমার চুপ করে যেতেই সত্যেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, তা ছাড়া কী?

বুঝতে পারছো না কেন, নরেনকে হত্যার দায় পুলিশ তো অরবিন্দ ঘোষের ওপরই চাপিয়ে দেবে। তাই সত্যেন, মন থেকে মুছে ফেলো ঐ ইচ্ছা। জেলের বাইরে যে বিপ্লবী বন্ধুরা আছেন, নরেনকে হত্যার দায়িত্ব তাঁরাই নেবেন। কারণ আমরা খবর পেয়েছি, অনেক আগে থেকে নরেন পুলিশের চর হিসেবে আমাদের মধ্যে কাজ করছে।

সে কী!

হ্যাঁ, ওর চালচলন, আমাদের ডাকাতি-টাকাতির ব্যাপারে ওর অতি উৎসাহ, আরও কিছু ঘটনা সেই সন্দেহই দৃঢ় করছে।

তাহলে তো ওকে ছাড়া চলবে না। ও বেঁচে থাকা মানেই দেশের ক্ষতি। সুতরাং...

সত্যেন্দ্রনাথকে থামিয়ে দিয়ে বারীন বললেন, ওকে নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। ওর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব জেলের বাইরে যারা আছে তারাই করবে।

জেলের মধ্যে এসব আলোচনা বেশিক্ষণ চলতে পারে না কিন্তু দলনেতার নির্দেশ মানতে পারলেন না সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি কী করবেন ঠিক করে ফেলেছেন।

এই প্রথম দলনেতার নির্দেশ অমান্য করবেন তিনি। নিরুপায় তিনি। বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি তিনি নিজের হাতে দিতে চান। নরেনকে আর কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখা যায় না। ওর জন্যে আরও কতজন ধরা পড়ে যাবে কে জানে!

কানাই যে তাঁর কাছে কাছেই আছে সত্যেন তা বুঝতে পারেননি। সকলে চলে যাবার পর সে কাছে এসে বললো, দাদা, আপনার সঙ্গে আমিও একমত। নরেন গোঁসাই-এর আর একদিনও বেঁচে থাকা উচিত নয়। দায়িত্বটা আমায় দিন। আমিই ওকে শেষ করি। কিন্তু অস্ত্র পাব কোথায়?

শুনলেই তো কোথায় পুঁতে রাখা আছে দুটো রিভলভার—বের করতে হবে।

সত্যেন বন্ধু হেমচন্দ্রর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে হাঁপানি অসুখের সুযোগ নিয়ে তাঁকে হাসপাতালে যেতে হবে। তারপর সেখানে গিয়ে কি করবেন তাও পরামর্শ করে ঠিক করা হয়ে গেল।

সত্যেন্দ্রনাথের সত্যিই হাঁপানি ছিল। জেলের ডাক্তারও তা জানতেন। হেমচন্দ্র ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে জানালেন, সত্যেনের হাঁপানির কষ্টটা বেড়েছে, ওকে এখনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দরকার। ডাক্তারবাবু এই তরুণ ছেলেদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এলেন। দেখলেন, সত্যেন হাঁপের কষ্টে ছটফট করছে। ডাক্তারবাবুর নির্দেশে সত্যেন্দ্রনাথকে তখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ছটফট করছেন আর বলছেন, জীবনে এ কী ভুল করলাম, এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। আমি বাঁচতে চাই। বাড়ি যেতে চাই।

কথাগুলো জেল কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছুতে খুব বেশি দেরি হলো না। একজন অফিসার এসে সহানুভূতি জানালেন সত্যেনকে। বললেন, ভুল করেছেন যখন বুঝতেই পেরেছেন তখন কেন অকারণে এত কষ্ট সহ্য করছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, সেই কথাই তো সব সময় ভাবছি। নরেন ঠিক কাজই করেছে।

খুশিতে ঝলমল করে উঠলো অফিসারটির মুখ। বললেন, আপনি রাজসাক্ষী হয়ে যান। সব কষ্ট থেকে মুক্তি পাবেন।

সত্যেন্দ্রনাথ অফিসারটির হাত চেপে ধরে বললেন, আমি তো তাই চাই। কিন্তু বন্ধুরা যেন জানতে না পারে। পুলিশকে কথা দিতে হবে তারা সব কিছু গোপন রাখবে। কাকপক্ষীও যেন টের না পায়।

কথা দিচ্ছি তাই হবে। আপনাকে আর জেলে যেতে হবে না। হাসপাতালেই আপনাকে আলাদা করে রাখা হবে।

সত্যেন্দ্রনাথ অ্যাপ্রুভার হতে রাজী হয়েছে জেনে পুলিশের কর্তারা খুশি হয়ে উঠলেন। সকলকে জানানো হলো, অসুস্থতার জন্যে সত্যেন্দ্রনাথকে জেল হাসপাতালে রাখা হয়েছে। নরেন গোঁসাই-এর কাছে খবর পৌঁছুতে দেরি হলো না। সে যারপরনাই খুশি। এখন আর সে একা নয়। সঙ্গী হিসেবে পেয়েছে দলের এক বড় নেতাকে। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মামা আজ রাজসাক্ষী। নরেনকে রাখা হয়েছিল দূরে ইউরোপীয় কয়েদীদের হাসপাতালে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে। সে একা রাজসাক্ষী হয়েছে বলে এতদিন ভয়ে ভয়ে ছিল। এবার সে একটু স্বস্তি পেল। অন্য হাসপাতালে থাকলেও এতদিনে তার একজন দোসর তো জুটেছে!

পুলিশের বড়কর্তাদের তবু কিছুটা সন্দেহ ছিল। তাই তাঁরা এসে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করলেন। কথা বলে বুঝলেন, সত্যেন্দ্রনাথ নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। সে বাঁচতে চায়। তাই রাজসাক্ষী হবে সে। পুলিশ কর্তারা ঠিক করলেন, পুরো ব্যাপারটা নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন তাঁরা। কথা প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, নরেনও তো আমার মতো রাজসাক্ষী হবে। তাই দু'জনের বয়ান একরকম হওয়ার দরকার। সেই জন্যে ওর

দেব সাহিত্য কুটীরের অভিধান

Students' Favourite Dictionary
(Eng. to Beng.)

Students' Favourite Dictionary
(Beng. to Eng.)

Dev's Concise Dictionary
(Eng. to Beng.)

Dev's Concise Dictionary
(Beng. to Eng.)

Pocket Dictionary
(Eng. to Beng.)

Pocket Dictionary
(Beng. to Eng.)

Midget Dictionary
(Eng. to Beng.)

Midget Dictionary
(Beng. to Eng.)

শব্দবোধ অভিধান

সরল অভিধান

নববিধান

সুবল মিত্রর
সরল বাংলা অভিধান

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৯

গুলিতে তিনি লুটিয়ে পড়লেন।

সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নিলে ভালো হয়।

উচিত কথাই বটে! দুই রাজসাক্ষী দু'রকম কথা বললে মামলা দাঁড়াবে না। দুঁদে ব্যারিস্টাররা তো আবার বিপ্লবীদের পক্ষে দাঁড়াবেন। তাই সত্যেন্দ্রনাথের কথা মেনে নিলেন পুলিশ কর্তারা। ঠিক হলো, নরেন গোঁসাইকে জেল হাসপাতালে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে আনা হবে।

ওদিকে জেলের লুকোনো জায়গা থেকে রিভলভার দুটি বের করা হয়েছে। তাতে গুলি ভরাই আছে। এবার হাসপাতালে পাঠাতে হবে সত্যেনের কাছে। সময় বেশি নেই। নরেন গোঁসাই আদালতে সাক্ষী দেবার আগেই তাকে শেষ করতে হবে। ঠিক হলো কানাইলাল হাসপাতালে রিভলভার নিয়ে যাবে।

নির্দিষ্ট দিনে কানাইলালের পেটে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হলো। ডাক্তার এলেন। সব দেখেশুনে বললেন, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করার দরকার। স্ট্রেচার এলো। কানাই কম্বলের তলা থেকে রিভলভার বের করে সকলের অলক্ষ্যে তলপেটে গুঁজে নিলো।

কানাইকে হাসপাতালে আনা হচ্ছে শুনেই সত্যেন ওয়ার্ডারকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে বললেন, এই সুযোগটা কাজে লাগানোর দরকার। তিনি নিজে একবার কানাইলালের সঙ্গে কথা বলতে চান। যদি সেও রাজসাক্ষী হয়ে যায়।

কথাটা ওয়ার্ডারের মনে ধরলো, কানাইলালের স্ট্রেচার এলো সত্যেনের বেডের পাশে। সত্যেনের ইঙ্গিতে প্রহরীরা সরে গেল। সত্যিই তো এসব কথা গোপনেই হওয়া উচিত। আর সেই সুযোগে কানাইয়ের কোমর থেকে রিভলভার এসে গেল সত্যেন্দ্রনাথের কোমরে। কানাইয়ের পরবর্তী কর্তব্যও জানিয়ে দিলেন সত্যেন।

ওয়ার্ডার বাইরে ছিলেন, তিনি হঠাৎ কানাইলালের চিৎকার শুনতে পেলেন। সে বলছে, তুমি নরাধম...তাই একথা আমায় বলতে পারলে, জেল হলে তোমায় এতক্ষণ...

প্রহরীরা ছুটে এসে কানাইলালকে স্ট্রেচারে করে অন্য জায়গায় নিয়ে চলে গেল।

ওয়ার্ডারকে ডাকলেন সত্যেন্দ্রনাথ। বললেন, আর দেরি করা উচিত নয়, কানাই জেনে গেছে। নরেনকে কালই আনুন, আমরা আমাদের স্টেটমেন্টটা লিখে ফেলি।

তাই ঠিক হলো। ওদিকে পেটের যন্ত্রণা কমে যাওয়ায় কানাইলালও জেলে ফিরে গেল।

পরদিন ১ সেপ্টেম্বর, সোমবার।

সক্কালবেলায় নরেনকে নিয়ে আসা হলো জেল হাসপাতালে। রক্ষী হয়ে এলেন হিগিনিস। সত্যেনের কথামতো তিনি কালি, কলম আর কাগজের ব্যবস্থা করে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। সত্যেন উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলেন, নির্দেশমতো কানাইলাল নিচের উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছে।

নরেন গোঁসাইয়ের তর সইছিল না। বললো, তাহলে আর দেরি কেন, কাজ শুরু করা যাক।

নিশ্চয়ই...বিশ্বাসঘাতক...দেশের শত্রু!

সত্যেনের হাতে উদ্যত রিভলভার। এক মুহূর্তও দেরি না করে তিনি গুলি ছুঁড়লেন।

নরেন আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠে সিঁড়িতে গিয়ে পড়লো। তারপর এক লাফে নিচে...সত্যেন্দ্রনাথ তাকে তাড়া করে আসছেন। হিগনিস বাধা দিতে এলেন। সত্যেনের গুলিতে তিনি লুটিয়ে পড়লেন। নরেন তখন ছুটে পালাচ্ছে।

কানাইলাল তৈরি ছিল। কোমর থেকে রিভলভার টেনে নিয়ে সে তাকে তাড়া করলো। গুলির আওয়াজ শুনে একজন রক্ষী জেলের পাগলা ঘন্টি বাজিয়ে দিয়েছে। জেলার ছুটে আসছেন। তিনি দেখলেন, নরেন গোঁসাই পালাচ্ছে। তার পেছনে রিভলভার হাতে ছুটে আসছেন সত্যেন্দ্রনাথ আর কানাইলাল। সামনে একটা বেঞ্চি দেখে জেলার তার তলায় ঢুকে আত্মগোপন করলেন। তাঁর দিকে নজর ছিল না সত্যেন-কানাইদের। তাঁদের চোখ নরেনের ওপর। নরেন ছুটতে ছুটতে কিছু একটায় হোঁচট খেয়ে নর্দমার ধারে পড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে তার ওপর লাফিয়ে পড়লেন বাংলা মায়ের দুই বীর সন্তান। গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিলেন বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইয়ের দেহ। গুলি ফুরিয়ে গেছে। রিভলভার দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তাঁরা।

ততোক্ষণে রক্ষীরা এসে গেছে। তারা দু'জনকে ধরে বেঁধে ফেললো।

মামলা উঠলো আদালতে। আলিপুরের সেশন জজ এফ আর রোর এজলাসে সেদিন ভিড়ে ভিড়। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলালের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন উকিল নরেন্দ্রনাথ বসু। তিনি ভেবে পাচ্ছেন না এদের কী করে বাঁচাবেন।

বিচারক কানাইলালকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিছু বলতে চাও?

না।

তোমার পক্ষে কোনো উকিল আছে?

না।

তুমি উকিল চাও?

না।

সত্যেন্দ্রনাথও একই উত্তর দিলেন। আরও বললেন, আমি কারো কাছে কোনো অপরাধ করিনি।

জেরার তৃতীয় দিন বিচারক কানাইলালকে বললেন, তুমি প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেটকে যে কথা বলেছিলে তা নাকি প্রত্যাহার করতে চাও?

হ্যাঁ চাই।

ঘরভরা কৌতূহলী মানুষ নড়েচড়ে বসলেন।

বিচারক বললেন, তাহলে তুমি কী বলতে চাও?

কানাইলাল বললো, আমি বলেছিলাম, আমি আর সত্যেন নরেন গোঁসাইকে মেরেছি। সে কথা প্রত্যাহার করে নিয়ে এখন বলছি, সত্যেন নয় আমি একাই বিশ্বাসঘাতককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। তাকে হত্যার দায়িত্ব একা আমার।

স্তব্ধ আদালত কক্ষে বিচারক দু'জনকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন।

ফাঁসির আগের দিন সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁর কোনো শেষ ইচ্ছে আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি দেখতে চাইলেন শিবনাথ শাস্ত্রীকে। সত্যেন্দ্রনাথ মানুষ হয়েছেন পিতৃব্য রাজনারায়ণ বসুর আদর্শে। তাই ধর্ম আর জীবন তাঁর কাছে ছিল অভিন্ন।

অশ্রুসজল চোখে বৃদ্ধ আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী এসে দাঁড়ালেন লোহার গরাদের এপারে। ওপারে দাঁড়িয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বসু। শান্ত কণ্ঠে তরুণ বললেন, আচার্য, যাবার আগে আমায় শান্তিমন্ত্র দিন।

আচার্য বললেন, তোমার পিতা ও পিতৃব্যকে স্মরণ করো। তাঁরা ছিলেন মুক্তপ্রাণ পুরুষ। তুমি চলেছো সেই আনন্দময় পিতৃসকাশে। ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি!!

ছবিঃ দিলীপ দাস

বিচিত্র খবর

বরুণ মজুমদার

হনুমানের থানা ঘেরাও

হনুমানের দল থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে আর অপরাধীকে ধরার দাবি জানাচ্ছে—এ ঘটনার কথা শুনলে অবাক হতে হয়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশে। কুড়িটা হনুমান থানার সামনে গিয়ে লম্ফ-ঝম্প জুড়ে দিল। থানার দরজা-জানলায় ধাক্কা দিয়ে আর হাত-পা নেড়ে সে কী তুমুল বিক্ষোভ! থানার দারোগাবাবু এবং অন্যান্য কর্তব্যরত পুলিশ তো রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। আসলে স্থানীয় একদল লোক একটা হনুমানের লেজ কেটে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে হনুমানের দলে খবর গেল। সবাই মিলে জড় হয়ে চলল থানায়। আভাসে ইঙ্গিতে তারা জানাল যে, এর বিচার চাই। লেজকাটা হনুমানটাকে তারা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিল। জলজ্যান্ত প্রমাণ। সুতরাং একটা কিছু তো করা চাই।

শেষ পর্যন্ত থানার দারোগাবাবুকে তারা টেনে নিয়ে চলল ঘটনাস্থলে। সেখানে গিয়ে দারোগাবাবু হনুমানের কাটা লেজের সন্ধান পেলেন। তিনি সেই হনুমানের দলকে আশ্বাস দিলেন অপরাধীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হবে। এতেই শান্ত হয়ে সেই হনুমানের দল সেখান থেকে খুশি মনে চলে গেল। তারপর দারোগাবাবু রীতিমতো তদন্ত করে অপরাধীদের সন্ধান পেলেন।

চিঠিপত্র

(মতামতের দায়িত্ব সম্পাদকের নয়)

কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা চাই

শুকতারায় একটি বিশেষ কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা করলে ভালো হয়। বাহাদুর বেড়াল অনেকদিন পাচ্ছি না কেন? নারায়ণ দেবনাথের 'ভয়ের মুখোশ' খুব ভালো লেগেছে।

কৌশিক বক্সী

(প্রযত্নে—দিলীপ বক্সী, সিউড়ি, বীরভূম)

পৌষ সংখ্যা ভালো লেগেছে

পৌষ সংখ্যা ভালো লেগেছে। ধারাবাহিক গোয়েন্দা উপন্যাস আনন্দ বাগচীর 'শুভঙ্করের আর্যা' এবং শা.প্রি.ব-র 'সৌরভকে সাবধান হতে হবে', সেই সঙ্গে বিদেশে ভারতের টেস্ট জয় ও ব্যাটসম্যানদের খতিয়ান খুব ভালো লেগেছে। লেখকদ্বয়কে ধন্যবাদ।

মাসুদ মণ্ডল (মিন্টু)

(প্রযত্নে—বাহারী পান সেন্টার, ভেবিয়া বাজার, পোঃ- ভেবিয়া, উঃ ২৪ পরগনা)

কমপিউটার শেখার লেখা

কমপিউটার শেখার ওপর লেখা যদি ছাপেন তাহলে খুব ভালো হয়। আমি নিজে কমপিউটার শিখছি। তাই মনে হচ্ছে, কমপিউটার সম্বন্ধে আমাদের যে সব বন্ধু বিশেষ কিছু জানে না, তারাও কমপিউটারের বেসিক ব্যাপার-ট্যাপারগুলো জেনে যাবে।

অমিতাভ মুখার্জি

(১৭, রাষ্ট্রগুরু অ্যাভিনিউ, পূর্বাচল অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট নং-১ সি, কলকাতা-৭০০ ০২৮)

ভৌতিক সংখ্যা

শুকতারার ভৌতিক সংখ্যাগুলো আমার খুব পছন্দ। ভূতের গল্প পড়তে ভালোবাসি। দাদুমণির চিঠিতে অনেকদিন গল্প পাইনি।

রুণা চক্রবর্তী

(সপ্তম শ্রেণী, জয়নগর মজিলপুর, দত্তপাড়া, পিন-৭৪৩৩৩৭)

সারমেয় সন্ধান

পৌষ সংখ্যায় সুধীন্দ্র সরকারের 'সারমেয় সন্ধান' গল্পটি আমার খুব ভালো লেগেছে। লেখককে ধন্যবাদ জানাবেন।

অসিত কান্তি সরকার

(কামাখ্যাগুড়ি, জলপাইগুড়ি)

পুরস্কৃত সেরা চিঠি

ভগবানের পরই বাবা-মা'র স্থান

আমাদের সমাজ পশ্চিমী সভ্যতা নকল করতে করতে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে আজ বেশির ভাগ ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে তাদের বৃদ্ধ বাবা-মাকে নিজের কাছে রাখাটাকে একটা বড় বোঝা বলে মনে করে। তাই তাঁদের জন্যে তৈরি হচ্ছে একটির পর একটি বৃদ্ধাশ্রম। একদিন টিভিতে দেখেছিলাম, একজন খুবই বৃদ্ধা মহিলা—যাঁর একটা চোখে দৃষ্টি নেই, তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে এসেছেন আর এক মহিলা। একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বাড়ির সকলের জন্যে খুব মন কেমন করে। নাতি-নাতনিদের কথা মনে করে কাঁদি। কেউ আসে না। খবরও নেয় না। জানি না ওরা সকলে কে কেমন আছে।

আজকের এই বৃদ্ধা কি কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে তাঁকে একদিন এমন অসহায় পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে! হয়তো নিজে সব দুঃখ, কষ্ট ভোগ করে ছেলেমেয়েদের গায় তার আঁচ লাগতে দেননি, সর্বস্ব খুইয়ে হয়তো তাদের মানুষ করেছেন, জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছেন, বিয়ে দিয়েছেন নিজেকে নিঃস্ব করে দিয়ে। তারই পুরস্কার কি এই মর্মান্তিক অবহেলা? যে সংসার তিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন, সেখান থেকে তিনি নির্বাসিত! ভাবতে অবাক লাগে, এ সব দেখেও কিন্তু আজকের বাবা-মারা তাঁদের সন্তান মানুষ করার প্রচেষ্টায় একটুও ফাঁক রাখেন না। তাঁরা কি তখন ভাবতে পারেন, একদিন ওঁদের অবস্থাও বৃদ্ধাশ্রমের ঐ অসহায় বৃদ্ধার মতো হবে?

আমি আমার এই চিঠির মাধ্যমে শুকতারার বন্ধুদের জানাতে চাই, ভগবানের পরই বাবা-মায়ের স্থান। তাই বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের সেবা-যত্ন করা, সুখ-শান্তি দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য। এই কথাটা আমরা যেন কোনোদিন ভুলে না যাই।

শাশ্বতী সিনহা

(ব্লক-২, ৫৫, নেতাজী সুভাষ রোড, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪)

সেরা চিঠি

স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার মতো 'সেরা চিঠি' বিভাগেও যদি আপনারা একটা বিষয় দিয়ে দেন তাহলে আমার মনে হয় বিভাগটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

বনবীথি পাল

(কাটোয়া, বর্ধমান)

আরো কমিকস চাই

শুকতারা আমার খুব ভালো লাগে। অগ্রহায়ণ সংখ্যাটা ভালো লেগেছে। মজার পাতা, তোমাদের পাতা, মনের জানলা, দাদুমণির চিঠি আমার খুব প্রিয়। কমিকসের সংখ্যা যদি আরো একটু বাড়ান তাহলে আরো খুশি হবো।

অনন্ত হাজং

(দ্বিতীয় শ্রেণী, রাধারানী ডি.এম.এফ.পি. স্কুল, নবনগর, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ)

সেরা চিঠি

সেরা চিঠি প্রতিযোগিতায় শুকতারার পাঠক-পাঠিকারা যে কোনো বিষয়ের ওপর (রাজনীতি বাদ দিয়ে) চিঠি লিখতে পারে। সেরা চিঠিটি শুকতারায় ছাপা হবে এবং তার জন্যে একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আনুমানিক একশো শব্দের মধ্যে চিঠি লিখতে হবে। যত খুশি চিঠি পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকটি চিঠির সঙ্গে নিচের কুপনটি থাকা চাই। কুপন ছাড়া কোনো চিঠি গ্রাহ্য হবে না। সেরা চিঠি মনোনয়নের ব্যাপারে শুকতারার সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। চিঠি পাঠাতে হবে সম্পাদক শুকতারার নামে। খাম বা ইনল্যান্ডের ওপর 'সেরা চিঠি' কথাটি লিখে দিতে হবে।

আমি শুকতারার 'সেরা চিঠি' প্রতিযোগিতায় আমার মনোনীত বিষয় নিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছি। চিঠির মতামত সম্পূর্ণ আমার।

স্বাক্ষর (পুরো নাম) ....

সম্পূর্ণ ঠিকানা ....

জিহাদপুরের সেই লোকটা

অনীশ দেব

পিকনিকের যখন দিনক্ষণ আয়োজন সব ঠিকঠাক তখন সুনীতকাকু হঠাৎ বলে উঠল, না, আমি গাড়ি চালাতে পারব না। তোমরা ড্রাইভার যোগাড় করো। সে-ই গাড়ি চালিয়ে আমাদের পিকনিক স্পটে নিয়ে যাবে।

সুনীতকাকু খুব ভালো গাড়ি চালায়। সেটা আমরা সব্বাই জানি। এতক্ষণ কাকু গাড়ি চালাতে রাজী ছিল। কিন্তু পিকনিক স্পটের নামটা শোনামাত্রই বেঁকে বসল। অথচ ড্রাইভার নিলে আমাদের খরচের চাপ বাড়বে।

কেন, গাড়ি চালাতে পারবি না কেন? রীতাপিসি জিগ্যেস করল।

সুনীতকাকু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। একটা খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে ঘোর-লাগা গলায় বলল, গড়বেতায় যেতে হলে জিহাদপুরের ওপর দিয়ে যেতে হয়। আর লক্ষ টাকা দিলেও আমি জিহাদপুরের ওপর দিয়ে যেতে পারব না। সে দিনে হোক কি রাতেই হোক।

কেন, জিহাদপুরে কী হয়েছে? লিলিদি, আমার জ্যাঠতুতো দিদি, জানতে চাইল।

সুনীতকাকু তক্ষুণি কোনও উত্তর দিল না। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরাল।

সিগারেট দেখে আমার চার বছরের বোন চন্দনা বায়না করতে লাগল। সুনীতকাকুর হাত ধরে টানতে লাগল আর বলতে লাগল, সাদা লজেন খাব, সাদা লজেন খাব।

আমি ওকে কোলে করে সরিয়ে নিয়ে এলাম। কিন্তু জেদ ধরে ও চিৎকার করতে লাগল, আর হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। ওর মুখে সেই এক কথা, সাদা লজেন খাব।

অন্যসময় হলে চন্দনাকে আদর করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বেশ তোয়াজ করতাম। কিন্তু এখন সেরকম মনের অবস্থা কোথায়! সুনীতকাকুর জন্যে আমাদের শীতকালের বাঁধা পিকনিকটাই ভেস্তে যেতে বসেছে।

লিলিদি আবার জানতে চাইল, কেন, জিহাদপুরে কী হয়েছে?

মাত্র চার বছর আগে একটা ব্যাপার হয়েছিল—এইরকমই শীতের সময়ে। তারপর থেকে ঠিক করেছি, জিহাদপুরের ওপর দিয়ে আর কখনও গাড়ি ড্রাইভ করে যাচ্ছি না।

কথা বলতে বলতে কান ধরার ভঙ্গিতে দু'হাত কানে ঠেকাল সুনীতকাকু। ঠোঁটে সিগারেট ধরা অবস্থাতেই বলল, হনুমানের দিব্যি—ও-রাস্তায় আর নয়!

আমি হেসে বললাম, হঠাৎ হনুমানের দিব্যি কেন?

আমাদের আর্লি স্টেজে হনুমান আমাদের ক্লোজ রিলেটিভ ছিল। মানে, লক্ষ লক্ষ বছর আগের কথা বলছি আর কী! তাই সিনিয়ারমোস্ট গুরুজন হিসেবে আমি হনুমানকে খুব রেসপেক্ট করি।

চন্দনা তখনও জেদ দেখিয়ে তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে মনে হলো, সুনীতকাকুর হনুমান-থিয়োরিটা বোধহয় একেবারে মিথ্যে নয়।

রীতাপিসি প্রায় চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, চার বছর আগে মাথামুণ্ডু কী না কী হয়েছে, তার জন্যে পিকনিক পণ্ড! তোর ওসব চালাকি ছাড়, সুনীত! আসলে তুই পিকনিকে যাবি না—তাই নানান ছুতো খুঁজছিস।

আমার খুব মন খারাপ লাগছিল। কারণ, আমার কাছে বছরের ছ'টা ঋতু হলো এইরকমঃ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, পিকনিক, বসন্ত। সেই পিকনিকটাই হবে না! খোলা মাঠ আর

গাছপালার মধ্যে শীতের রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসে খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলো, গানবাজনা—সব মাটি!

লিলিদি চন্দনাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে বলল, সুনুকা, তুমি কি সিরিয়াসলি বলছ, নাকি ঠাট্টা করছ?

সিগারেটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সুনীতকাকু বলল, বিশ্বাস কর—সিরিয়াসলি বলছি। তোরা অন্য কোথাও পিকনিক স্পট ঠিক কর—সেটাই ভালো হবে।

কেন, কী হয়েছিল তোর ওই জিহাদপুরে—সাতজন্মে নাম শুনিনি! খুলে বল দেখি! রীতাপিসি ভাইকে যেন সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাল।

শোন তা হলে! বলল সুনীতকাকু, তবে ছোটরা কিন্তু ভয় পেতে পারে।

আমি বললাম, ভয়! পিকনিক পণ্ড হওয়ার ভয়ে আমি অস্থির! এর চেয়ে বেশি ভয় আর কিছুতে আছে নাকি!

সুনীতকাকু কিন্তু বেশ গম্ভীর গলায় বলল, আছে—জিহাদপুরের ভয়। শোন, বলছি....

তোরা তো জানিস, ছোটবেলায় আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন। তারপর থেকে বলতে গেলে জেঠামশায়ের কাছেই আমি মানুষ। জেঠামশায় দারুণ মানুষ ছিলেন। আজকাল এরকম গুরুজন পাওয়াই মুশকিল। আমার ছোটবেলাটা এত দারুণ কেটেছিল যে, এখনও সেসব দিনের কথা মনে পড়লে মনটা কেমন হয়ে যায়।

জেঠামশায় বরাবর মহানগঞ্জে থাকতেন, জমি-জমা দেখাশুনো করতেন। শহর ওঁকে মোটেই টানত না। বছর চারেক আগে তিনি একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি কলকাতা থেকে গাড়ি চালিয়ে ওঁকে দেখতে গেলাম। তখন বুঝতে পারিনি যে, আমি জিহাদপুরের ওপর দিয়ে গেছি।

তিনদিন পর কলকাতার পথে যখন রওনা হলাম তখন মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কারণ, জেঠামশায়ের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। বলতে গেলে এখন-তখন।

সুতরাং গাড়ি চালিয়ে ফেরার পথে মনটা কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। বারবার ছোটবেলার কথা মনে পড়ছিল। আর ভুলে যাচ্ছিলাম যে, ছুটন্ত গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বসে আছি।

শীতের সময়। সন্ধ্যে নেমে গেছে অনেকক্ষণ। সোয়েটার-জ্যাকেট পরে গাড়ির ভেতরে বসে থাকলেও কনকনে শীত হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় কুয়াশা ভেদ করে কালো পিচের রাস্তা আবছা দেখা যাচ্ছিল

দিব্যি গাড়ি চালিয়ে আসছি, হঠাৎই দেখি আমার ঠিক সামনে মাথায় ঘোমটা দিয়ে চাদর মুড়ি দেওয়া একটা লোক কোত্থেকে এসে যেন দাঁড়িয়ে পড়ল।

লোকটা এত আচমকা গাড়ির সামনে হাজির হলো যে, মনে হলো সে ঠিক একটা গাছের মতো মাটি ফুঁড়ে মাথাচাড়া দিয়েছে।

ব্যস! যা হওয়ার তাই হলো। আমি প্রাণপণে ব্রেক কষলাম বটে, স্টিয়ারিংও কাটালাম, কিন্তু কোনও লাভ হলো না। লোকটা এত কাছে দেখা দিয়েছিল যে, পৃথিবীর কোনও ড্রাইভারই ওকে বাঁচাতে পারত না।

আমার গাড়ি সপাটে লোকটাকে ধাক্কা মারল। বীভৎস একটা শব্দ হলো। লোকটা কোথায় কাত হয়ে পড়ল দেখতে পেলাম না। আরও অন্তত হাতদশেক গিয়ে তবে আমার গাড়ি থামল। স্টিয়ারিং কাটানোর ফলে গাড়িটা পিচের রাস্তা ছেড়ে মাটির ওপরে নেমে এসেছে। আর আমি হতভম্ব হয়ে চুপচাপ বসে আছি। ভাবছি, লোকটা আছে, না খতম হয়ে গেছে!

একটু পরে যখন কাণ্ডজ্ঞান ফিরে পেলাম তখন দরজার হাতল ঘুরিয়ে গাড়ি থেকে নামতে গেলাম। বুকের ভেতরে ধড়াস-ধড়াস শব্দ হচ্ছিল। এর আগে আমি কখনও মানুষকে ধাক্কা মারিনি। আশপাশে তাকিয়ে দেখলাম, কোনও লোকজন চোখে পড়ে কি না।

নাঃ, কেউ নেই।

হঠাৎই বন্ধ কাচের জানলায় ঠক-ঠক শব্দ হলো।

চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখি বাঁদিকের দরজার বাইরে চাদর মুড়ি দেওয়া একজন মানুষ সামান্য কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হেডলাইটের আলো গাছের গুঁড়িতে ঠিকরে পড়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে যাচ্ছিল। তারই আভায় লোকটির মুখ আবছা চোখে পড়ছিল। তাছাড়া কপালের ওপরটায় চাদরের আড়াল থাকায় চোখ দুটো প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না।

তবে লোকটা বোধহয় পান খাচ্ছিল। কারণ, ওর ঠোঁটের কোণ দিয়ে পানের রস গড়িয়ে পড়ছিল।

লোকটা ইশারায় আমাকে জানলার কাচটা নামাতে বলল।

আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল। গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করলে তারপর যা-যা হয় সেসব মনে পড়ছিল: গণধোলাই, পুলিশের হাতে নাকাল হওয়া, ঘুষ—আরও কী-কী আছে কে জানে!

কোনও কথা না বলে কাঁপা হাতে জানলার কাচটা নামালাম।

সঙ্গে সঙ্গে রুক্ষ কর্কশ গলায় লোকটি বলে উঠল, একটু দেখে চালাতে পারেন না! স্টিয়ারিং হাতে পড়লেই কি জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ফেলেন!

আমি সাফাই হিসেবে কিছু একটা বলতে গেলাম, কিন্তু ঠোঁট কেঁপে ওঠাই সার—গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোল না। আশ্চর্য! এরপরেও লোকটা বেঁচে আছে!

একটা ঠাণ্ডা ভয় আমাকে ক্রেপ ব্যান্ডেজের মতো জড়িয়ে ধরল। তারপর সেই ভয়টা চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে যেতে লাগল আমার শরীরের ভেতরে।

কী যে হলো আমার, আচমকা গাড়ি স্টার্ট করে পাগলের মতো গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম।

ধুলো উড়ল, ইঞ্জিনের গোঁ-গোঁ শব্দ হলো, ক্ষিপ্র হাতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ি

তুলে নিয়ে এলাম রাস্তায়। তারপর শুধু অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে রাখলাম। মনে শুধু একটাই চিন্তা : এখান থেকে যেভাবে হোক পালাতে হবে।

গাড়ি আমার কথা শুনেছে। সামনের পিচের রাস্তাটা মরিয়া হয়ে ছুটে যাচ্ছে পিছনদিকে।

খোলা জানলা দিয়ে হু হু করে বাতাস ঢুকছিল। আমার প্রচণ্ড শীত করার কথা, কিন্তু আতঙ্কে শীতের কামড়টা টের পাচ্ছিলাম না।

এই যে বেপরোয়া গাড়ি চালাচ্ছেন—দেখবেন, আবার একটা অ্যাকসিডেন্ট হবে।

কে বলল কথাটা!

চমকে বাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি গাড়ির জানলায় সেই লোকটা। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে ছুটছে। এক হাতে জানলার নামানো কাচটা চেপে ধরে আছে।

আমি পাথর হয়ে গেলাম।

গাড়ি ঘণ্টায় অন্তত ষাট-সত্তর কিলোমিটার বেগে ছুটছে। লোকটা এই গতিবেগের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে কী করে! এ যে বেন জনসনকে হার মানায়!

সামান্য হেসে লোকটা বলল, আমরা জিহাদপুরের লোক। অন্যায় দেখলেই আমরা প্রতিবাদ করি। আপনি যে আমার বডির ওপর দিয়ে গাড়িটা চালিয়ে দিলেন, এর বিহিত করবে কে!

আমি কোনও জবাব দিতে পারলাম না। রোবটের মতো গাড়ি ছুটিয়ে চললাম।

লোকটা জানলার ফ্রেমে আঁটা ছবির মতো গাড়ির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নির্বিকারভাবে ছুটে চলল। আর একনাগাড়ে ওর প্রতিবাদ জানিয়েই চলল।

জিহাদপুরের লোকদের কাছে অন্যায় জুলুম চলবে না। আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করতে জানি। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের প্রোটেস্ট থামবে না। এমনকী মরে গেলেও আমরা প্রতিবাদ করতে ছাড়ি না—আমাদের জেদ এমন!

লোকটার শেষ কথাটা আমাকে যেন চাবুকের বাড়ি মারল।

মরে গেলেও আমরা প্রতিবাদ করতে ছাড়ি না...। তার মানে!

আমার হাতের কথা স্টিয়ারিং আর শুনল না। পলকে বেসামাল হয়ে গেল। গাড়ির পথটা এলোমেলো হয়ে গিয়ে আমি শেষ পর্যন্ত ধাক্কা মারলাম রাস্তার ধারের একটা মোটা গাছের গুঁড়িতে।

যে-কোনও ভাবেই হোক, আমার বাঁ পা নিতান্ত অভ্যাসবশে চেপে বসেছিল ব্রেকের ওপর। তাই ধাক্কাটা সেরকম মারাত্মক হয়নি।

তালগোল পাকানো শব্দ হলো নানারকম। ব্রেক কষার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আর্তনাদ, আমার ভয়ের চিৎকার, আর সবশেষে সংঘর্ষের শব্দ।

আমি স্টিয়ারিং-এর ওপরে মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁফাচ্ছিলাম। একটু সময় নিয়ে আড়চোখে তাকালাম জানলার দিকে।

ভেবেছিলাম, জানলায় জিহাদপুরের লোকটাকে আর দেখতে পাব না। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আমার চোখের ভুল ছিল—এখন সেই অলীক স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে।

কিন্তু না। লোকটা তখনও জানলায় রয়েছে।

ওর মাথার ঘোমটা সরে গেছে। এখন ওর চোয়াড়ে মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঠোঁটের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়া জিনিসটাকে আগে পানের রস ভেবে ভুল করেছিলাম।

এখন বুঝলাম, ওটা রক্তের রেখা।

লোকটার বাঁ গাল বেয়েও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বোধহয় মাথায় চোট পেয়েছে।

আমার চিন্তাভাবনা সব জট পাকিয়ে শুধু আতঙ্ক মনে বাসা বেঁধেছিল। সেই আতঙ্কের ঠেলায় ডান হাতে আমার দিকের দরজাটা খুলে ফেললাম। পালাতে হবে! যেভাবেই হোক, এই ভয়ঙ্কর লোকটার কাছ থেকে আমাকে পালাতে হবে!

দরজা খুলে সবে একটা পা গাড়ির বাইরে রেখেছি, তক্ষুণি লোকটা বকবক করতে করতে এক হ্যাঁচকায় ওর দিকের দরজাটা হাট করে খুলে ফেলল।

দেখুন! আমার কী হাল করেছেন দেখুন! আর আপনি এখন পালাচ্ছেন!

খোলা দরজা দিয়ে যা দেখলাম তা যেমন ভয়ঙ্কর তেমনই অবিশ্বাস্য।

মাথা থেকে শুরু করে রক্তাক্ত কোমর পর্যন্ত পৌঁছেই লোকটার শরীর শেষ হয়ে গেছে। তারপর শুধু শূন্য!

যেন বাতাসে ভর করে একটা অর্ধেক মানুষ রক্তাক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমার দাঁতে-দাঁতে ঠোকাঠুকি লেগে গিয়েছিল। চোখ দুটো বোধহয় ভয়ে পাগল হয়ে বাইরে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। বিশাল হাঁ করে ফেলেছিলাম এক প্রাণান্ত চিৎকার করে ওঠার জন্যে।

ঠিক তখনই লোকটা ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, দেখেছেন, আপনার গাড়ি চাপা পড়ে আমার বডিটা একেবারে দু-আধখানা হয়ে গেছে! নিচের অর্ধেকটা সেই অ্যাকসিডেন্টের জায়গাতেই পড়ে আছে। চলুন, দেখবেন চলুন, মিথ্যে বলছি কি না!

লোকটা হাত বাড়াল আমার হাত ধরার জন্যে।

তারপর আর আমার কিছু মনে নেই।

পরদিন জেনেছি, গাড়ির জ্বলন্ত হেডলাইট দেখে স্থানীয় লোকজন আমাকে খুঁজে পেয়েছিল।

আর ওরা কখনও জিহাদপুরের নাম শোনেনি।

সুনীতকাকুর গল্প শেষ হওয়ার পর আমরা আর কোনও কথা বলতে পারলাম না।

ছবি ঃ সমীর সরকার

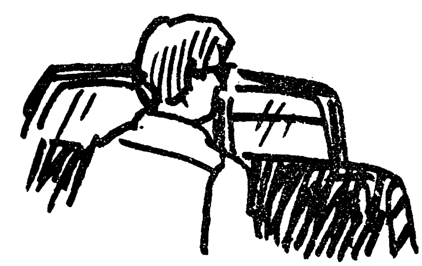

হাঁদা-ভোঁদার
ডেঙ্কির খেলা
পকেট ফাঁকা তাই টাকার জন্যে অমন দুর্দান্ত ফাইটিং ছবি 'গোলি চলে দনাদ্দন' দেখা হয়নি। এবারে দ্যাখ্ মোটা টাকা হাতের মুঠোয়।
· হারাইয়াছে ·
এই সাদা রংয়ের ওপর কালো ফুটকি দেওয়া কুকুরটি হারাইয়াছে। কেহ খুঁজিয়া দিলে মোটা অর্থ পুরস্কার দিব।
নেকুরাম নিয়োগী
৩০, কুকুড়ো পল্লী।
কুকুরটাকে পাকড়াও করে ওর মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই টাকা আমার মুঠোয় এসে যাবে।
কিন্তু ঐ কুকুরটাকে তুই পাবি কোথায়?
খুঁজতে হবে। আরে, ঐ রকমই তো একটা কুকুর ডাস্টবিনের ফ্যালা নোংরা খাচ্ছে!
তাহলে কাছে গিয়ে দ্যাখ।
তবে মনে হচ্ছে এটা সেই কুকুর নয় রে, হাঁদা!
আয় আয়, বাচ্চু! চুক্ চুক্!
গরর্! খ্যাঁক-খ্যাক!
ওরে বাবা! হতচ্ছাড়াটা কামড়াতে আসছে যে রে!
খ্যাক! খ্যাক!
তোকে বললুম এটা নয়, এটার গায়ে ফুটকি নেই।
এখুনি ওটা তেড়ে কামড়াতে এসেছিলো। কুকুর খোঁজা ছেড়ে দে, হাঁদা!
ছেড়ে দেবো মানে? যেভাবে হোক কুকুর দিয়ে পুরস্কার নিতেই হবে।
কিন্তু খুঁজে পাবি কোথায়?
কোথায় পাবো তাই না? পাবার একটা দারুণ আইডিয়া এসেছে রে, ভোঁদা! শুধু দেখে যা ডেঙ্কির খেল!!
আরে, এ তো পাড়ার নিরীহ কালো রংয়ের কুকুর, কেলো!
এই কেলোই পুরস্কার এনে দেবে!

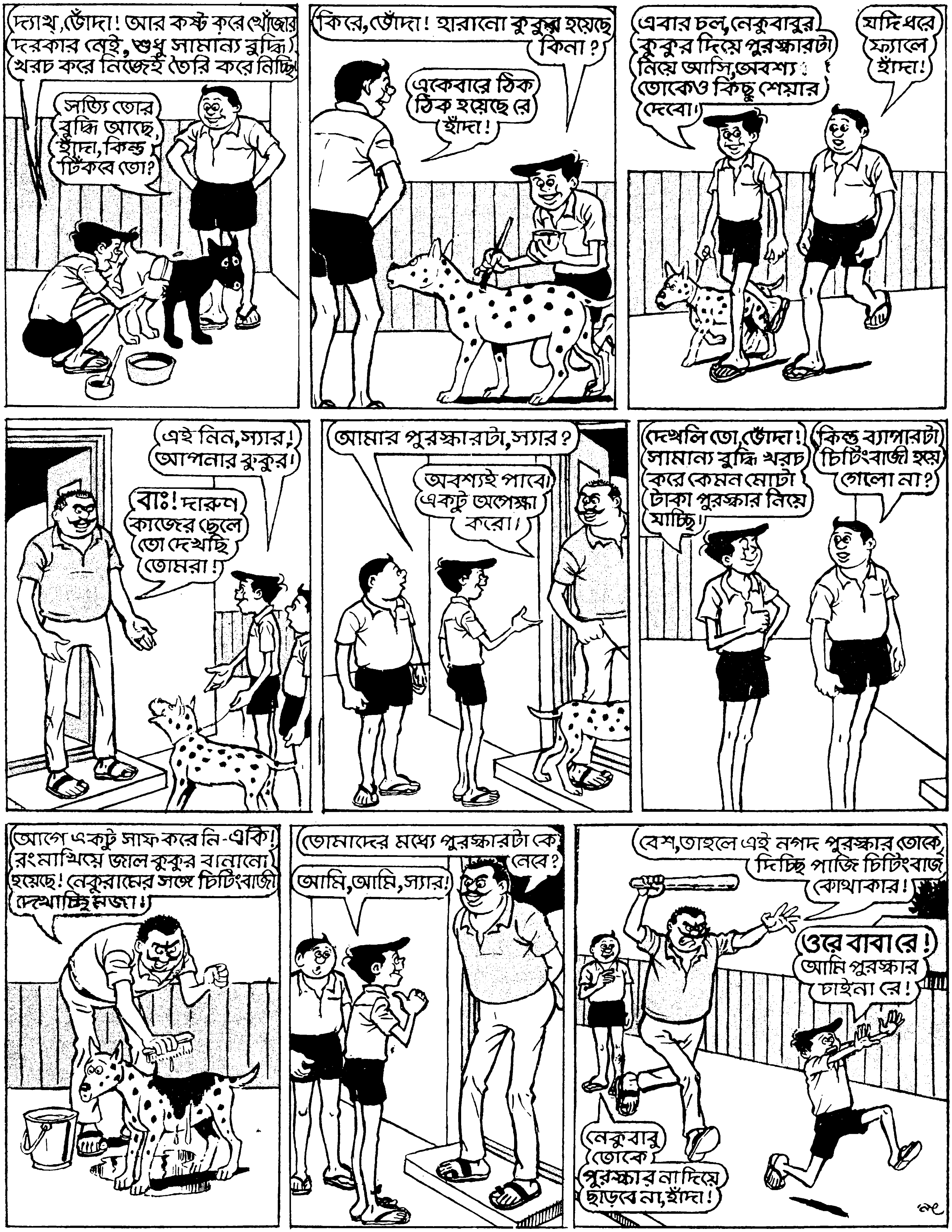
দ্যাখ্, ভোঁদা! আর কষ্ট করে খোঁজার দরকার নেই, শুধু সামান্য বুদ্ধি খরচ করে নিজেই তৈরি করে নিচ্ছি।
সত্যি তোর বুদ্ধি আছে, হাঁদা, কিন্তু টিঁকবে তো?
কিরে, ভোঁদা! হারানো কুকুর হয়েছে কিনা?
একেবারে ঠিক ঠিক হয়েছে রে হাঁদা!
এবার চল, নেকুবাবুর কুকুর দিয়ে পুরস্কারটা নিয়ে আসি, অবশ্য তোকেও কিছু শেয়ার দেবো।
যদি ধরে ফ্যালে হাঁদা!
এই নিন, স্যার! আপনার কুকুর।
বাঃ! দারুণ কাজের ছেলে তো দেখছি তোমরা!
আমার পুরস্কারটা, স্যার?
অবশ্যই পাবে। একটু অপেক্ষা করো।
দেখলি তো, ভোঁদা! সামান্য বুদ্ধি খরচ করে কেমন মোটা টাকা পুরস্কার নিয়ে যাচ্ছি।
কিন্তু ব্যাপারটা চিটিংবাজী হয়ে গেলো না?
আগে একটু সাফ করে নি-একি! রং মাখিয়ে জাল কুকুর বানানো হয়েছে! নেকুরামের সঙ্গে চিটিংবাজী দেখাচ্ছি মজা।
তোমাদের মধ্যে পুরস্কারটা কে … নেবে?
আমি, আমি, স্যার!
বেশ, তাহলে এই নগদ পুরস্কার তোকে দিচ্ছি পাজি চিটিংবাজ কোথাকার!
ওরে বাবা রে! আমি পুরস্কার চাইনা রে!
নেকুবাবু তোকে পুরস্কার না দিয়ে ছাড়বে না, হাঁদা!

মনের জানলা

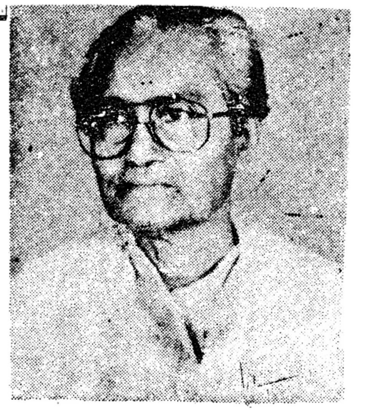

জগদিন্দ্র মণ্ডল

**[অধ্যাপক, ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন ডিন (বিজ্ঞান) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।]**

প্রশ্নঃ আমি 'মনের জানলা' বিভাগের নিয়মিত পাঠিকা। এই বিভাগ চালু হওয়ায় আমার মতো অনেক ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়েছে। আমি ইদানীং লক্ষ্য করছি যে আমার পড়াশুনায় একদম মন বসছে না। সেই কারণে স্কুলে বা প্রাইভেট কোচিং-এ নিয়মিত পড়া করে যেতে পারছি না। আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আমার পরীক্ষার ফল ভাল হতো। ক্লাসে বার্ষিক পরীক্ষার ফলে আমার পঞ্চম স্থান ছিল সবার মধ্যে। কিন্তু এবার পরীক্ষায় আমাদের শ্রেণীতে যে ছাত্রীটি প্রথম হয়েছে, তার থেকে আমি ১০০ নম্বর কম পেয়েছি। বাড়িতে সবাই আমাকে বকাবকি করছে। স্কুলে যাদের সঙ্গে আমি মেলামেশা করি তারা সবাই আমার থেকে বেশি নম্বর পাওয়ায় আমাকে মোটেই গ্রাহ্য করছে না। মা-বাবা বলছেন যে আমি আর কোনোদিনও ভাল রেজাল্ট করতে পারব না। আমার হাতের লেখাও ইদানীং নোংরা হয়ে গেছে, অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আমার স্মৃতিশক্তি কমে যাচ্ছে। আমি নিজের মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব গড়তে চাই। আমি আমাদের জেলার একটা নামী স্কুলে পড়ি। আমার এখন কী করণীয় জানালে উপকৃত হব। এর আগেও দু'বার চিঠি দিয়েছি, কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি। আমি গল্পের বই পড়তে খুব ভালবাসি, কিন্তু আমার গৃহ-শিক্ষিকা আমাকে গল্পের বই পড়তে নিষেধ করেন। আমার মতো ছাত্রীর দিনে কত ঘণ্টা পড়াশুনা করা উচিত?

—রিম্পা সাধুখাঁ, বিদ্যাসাগর পল্লী, ঝলঝলিয়া, মালদা।

উত্তরঃ তুমি এর আগে দু'বার চিঠি দিয়ে উত্তর পাওনি লিখেছ; এত চিঠি আসে যে স্থানাভাবে ইচ্ছা থাকলেও যথাসময়ে চিঠির উত্তর দিয়ে উঠতে পারি না—সেজন্য মনে কিছু করো না। তোমাদের প্রত্যেকের সমস্যার কথাই আমাদের গোচরে থাকে। একটা পরীক্ষার ফল খারাপ হলেই আর কিছু হবে না, এরকম ভাববার কোনো কারণ নেই। তোমার বাবা-মা বলেছেন, তুমি আর কোনোদিন ভাল রেজাল্ট করতে পারবে না। এরকম সিদ্ধান্তে আসার আমি কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার হাতের লেখা তো এখনও খুব সুন্দর ও গোছানো। একটি বানান ভুল নেই। আমার তো তোমার বুদ্ধি ও মেধার উপর যথেষ্ট আস্থা আছে। তুমি লিখেছ, কিছুদিন হলো তোমার পড়াশুনায় একদম মন বসছে না। মন কিসে বসছে ভেবে দেখেছ? মন তো শূন্যে ভাসে না, সবসময় কিছু না কিছুতে গিয়ে মন বসে। হয় পড়ায়, নয় খেলায়, নয় আড্ডায়, নয় গল্পের বই পড়ায়, নয় সিনেমায়, নয় গানে—ভেবে দেখ তো, তোমার মন এখন কীসে সবচেয়ে বেশি বসতে চাইছে! মন সবসময় মজা খোঁজে, আনন্দ খোঁজে। যে মজা, যে আনন্দ অল্প আয়াসেই পাওয়া যায়, প্রায় কোনো কষ্ট না করেই, সে মজা, সে আনন্দ বেশি দিন থাকে না। সেটা হয় তাৎক্ষণিক ও স্বল্পস্থায়ী। আর যে মজা কষ্ট করে, পরিশ্রম করে, অধ্যবসায় দিয়ে পাওয়া যায় সে মজা হলো স্থায়ী, এর রেশ থাকে অনেকদিন, জীবনভর। যখন অ আ ক খ শিখেছিলে, মা-বাবা ধরে ধরে যখন শিখিয়েছিলেন, তখন তোমার সেটা খুব ভাল লাগত কি? তখন কি মনে হতো কী কষ্ট, খেলা ছেড়ে লেখা নিয়ে বসতে হচ্ছে, পড়া নিয়ে বসতে হচ্ছে? যখন অক্ষর শেখা হয়ে গেল, পড়তে শিখলে, লিখতে শিখলে, তখন ভাল লাগেনি? এখন যে গল্পের বই পড়ে এত মজা পাচ্ছ, সেটা তো কষ্ট করে বর্ণপরিচয়, শব্দপরিচয়, বাক্যপরিচয় হয়েছিল বলে, লিখতে পড়তে কষ্ট করে শিখেছিলে বলে। আজও একই কথা—কষ্ট করে, নিয়ম করে, অন্যসব ক্ষণিকের মজা ছেড়ে, অনেকটা সময় দিয়ে পড়তে হবে—পড়াটা বুঝতে হবে, পড়ার মধ্যে যে মজা ও আনন্দ আছে, নতুনকে জানা, নতুনকে আবিষ্কার করার মধ্যে যে চমক ও মজা আছে, সেটাকে একটু স্থির চিত্তে সময় দিয়ে খুঁজে পেতে হবে, তবেই তোমার মন খুব একটা অন্যদিকে যাবে না—পড়ায় নিবিষ্ট হবে। নিবিষ্ট মনে দিনে ছয়-সাত ঘণ্টা নিয়মিত পড়, দেখবে তোমার রেজাল্ট আবার ভাল হবে, আগের চেয়েও ভাল হবে। স্মৃতিশক্তি কিছুই তোমার কমেনি, শুধু পড়ার কথা মনে বেশি না থেকে, অন্যসব কথা বোধহয় স্মৃতিকে বেশি ঘিরে থাকছে! আত্মবিশ্বাস, নিয়ম-নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় থাকলে তোমার ব্যক্তিত্ব যেমন গড়ে উঠবে, জীবনে সাফল্যও আসবে সবদিকে, ক্লাসের পরীক্ষায় যেমন, জীবনের সব পরীক্ষায়ও তেমনি। ভাল গল্পের বই পড়ায় কিছুটা সময় নিশ্চয়ই তুমি দিতে পার।

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

নববর্ষের প্রীতি, শুভেচ্ছা আর প্রাণভরা ভালোবাসা নাও। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, নতুন বছরটা তোমাদের যেন আনন্দে কাটে।

ওদিকে বেশ গরম পড়ে গেছে, তাই না? রোদের তেজও খুব। সূর্যদেব এখন সাত তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে উঠে পড়েন। সাড়ে পাঁচটার আগেই পুব আকাশে উঁকি দেন। সারাদিন আগুন ছড়িয়ে অস্তে যান ৫টা ৫২ মিনিট ৩৮ সেকেন্ডে। তার মানে দিনটা এখন বড় হয়ে গেছে। প্রকৃতির রাজ্যে এখনো বিগত বসন্তের ছোঁয়া। নতুন পাতার পোশাক পরে গাছপালারা ঝলমল করছে। অশোক, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া গাছে এখন রাঙা হাসি। বাঁদরলাঠি গাছে আঙুরের থোলোর মতো ফুল ঝুলছে। শিরীষ নাড়াচ্ছে ফুলের চামর। বেল আর মুচকুন্দ চাঁপার গন্ধে চারদিকে ম-ম করছে।

গাজনের সন্ন্যাসীদের 'তারকনাথের চরণের সেবা লাগে' বলে হাঁক দেওয়ার পালা শেষ হয়ে এল। শেষ চৈত্রে গাজনের মেলা আর তারপরই হালখাতা। নববর্ষের প্রথম দিনটিতে দোকানে দোকানে হালখাতা ছাড়াও কতো অনুষ্ঠানই না হয়। সেই আনন্দে রোদের তাপ আর গরমের কষ্ট গায়েই লাগে না। এরই মাঝে কোনো কোনো দিন দুপুর গড়াতে না গড়াতে দস্যুর মতো ধেয়ে আসে কালো মেঘ। প্রথমে শোঁ শোঁ করে ধুলোর ঝড়। মেঘের বুক চিরে ডাইনির জিভের মতো লক্‌লক্ করে বিদ্যুৎ চমকায়। তারপরই কড় কড় কড়াৎ করে বাজ পড়ার শব্দ। সেই সঙ্গে নামে বৃষ্টি। সন্ধ্যের পর মেঘ কেটে গিয়ে নীল আকাশে মিটমিট করে তাকায় তারার দল। উত্তর আকাশে জ্বলজ্বল করে ধ্রুবতারা আর সপ্তর্ষিমণ্ডল, মুখ ফিরিয়ে পশ্চিম দিকে তাকালে দেখতে পাবে ছায়াপথ আর কালপুরুষ। তারও নিচে লুব্ধক আর অগস্ত্য নক্ষত্র, এই দুইয়ের মাঝখানে সিংহরাশি'র পূর্ব আর উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র। পুবদিক ঘেঁষে আছে স্বাতী, কন্যা আর তুলারাশি। তুলারাশিই বৈশাখ মাসের নতুন নক্ষত্রমণ্ডলী। ছাদে উঠে যদি আকাশের তারাদের চিনতে পারো তাহলে দেখবে কী আনন্দই না হবে। মজাও পাবে। দেখো না চেষ্টা করে।

এবার এসো তোমাদের চিঠির ঝাঁপি খুলি।

নিরুপম চক্রবর্তী (২৭, ত্রিপুরা পল্লী, পোঃ বোড়াল, দঃ ২৪ পরগনা, ৭৪৩৫০৫)

উত্তর : সে কী! শুকতারার বয়েস কতো জানো না? প্রচ্ছদ আর সূচীপত্রে যে বড় বড় করে '৫৪' লেখা থাকে দেখোনি? তার মানে শুকতারার বয়েস এখন ৫৪।

শর্মিষ্ঠা গুহ রায় ও অন্বিতা দত্ত (প্রযত্নে—বিজয় রঞ্জন গুহ রায়, ৩, দিনুবাবুর গলি, গোরাবাজার, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১)

উত্তর : এই তো চিঠির উত্তর পেলে। তোমাদের নামও ছাপা হলো। খুশি তো?

সৌমিত্রা দাস (প্রযত্নে—শীতাংশু কুমার দাস, রবীন্দ্রপল্লী (বুড়াবুড়ি তলা) লেন-৩, মালদা-৭৩২১০১)

উত্তর : ভূতের গল্প পড়তে-সকলেই ভালোবাসে তাই না? দেখো শুকতারার বন্ধুরাই তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড হবে।

জিনা দাস (প্রযত্নে—এম. কে. দাস, ১২/২৪, এ সি রোড, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ)

উত্তর : আর রাগ নেই তো? শুকতারায় গা-ছমছমে ভূতের গল্প পাবে।

অরিজিৎ চক্রবর্তী (প্রযত্নে—ছবি চক্রবর্তী, সেন বাজার, নর্থ স্টেশন রোড, পোঃ-আগরপাড়া, উঃ ২৪ পরগনা-৭৪৩১৭৭)

উত্তর : তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। মন দিয়ে পড়ছো তো? পরীক্ষা যে এসে গেল। ঠিকই তো—শুকতারার বন্ধুরাই তো আমাদের আসল বন্ধু।

সৈয়দ রায়হান (প্রযত্নে—সৈয়দ সাজাহান, গ্রাম-কাজীপাড়া (গৌড়হাটি মোড়), পোঃ-আরামবাগ, হুগলি-৭১২৬০১)

উত্তর : শুকতারা তোমার বন্ধু বলেই সব সময়ের সঙ্গী। শুকতারার বন্ধুরা তোমায় নিশ্চয়ই চিঠি দেবে।

শুভঙ্কর সরকার (প্রযত্নে—সুভাষ সরকার, পোঃ-চাকদহ, জেলা-নদীয়া (কে.বি.এম. অগ্রণী সংঘের কাছে), প্লট নং-২৪, চাকদহ-৭৪১২২২)

উত্তর : পড়তে যখন ইচ্ছে করবে না তখন বাড়ির মধ্যে একটু ঘুরে বেড়াবে। তারপর চোখ, মুখ, কান ভালো করে ধুয়ে পড়তে বসবে। দেখবে আর অসুবিধে হবে না। খুব ভোরবেলায় উঠে যদি পড়তে বসো তাহলেও উপকার পাবে।

শমীক মল্লিক (প্রযত্নে—সুকুমার মল্লিক, ছোটবাজার, মেদিনীপুর-৭২১১০১)

উত্তর : গত ভাদ্র সংখ্যাটাই তো গোয়েন্দা সংখ্যা। খেয়াল করনি? আমার বেলুড়মঠের অভিজ্ঞতা তোমাদের মনে দাগ কেটেছে জেনে খুশি হয়েছি। শুকতারার বন্ধুরা তোমায় চিঠি দেবে। তুমিও দাও না।

সৌরভ ঘোষ (নবম শ্রেণী, স্কুলের নাম-ঠিকানা নেই)

উত্তর : তুষার শীলের যোগ ও ব্যায়াম তোমার ভালো লাগে। তুমি পেশী গঠনের জন্যে কিছু ব্যায়াম চাও। তুষার শীল তা নিশ্চয়ই লিখবেন।

গণেশ চন্দ (প্রযত্নে—বরুণ গড়াই, ধুনরাপ্লট, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩)

উত্তর : শারদীয়া সংখ্যায় দাদুমণির চিঠিতে 'গণেশ দাদার' গল্প পড়ে তোমার ভালো লেগেছে জেনে আমারও ভালো লাগছে। শারদীয়া সংখ্যা পড়ে আনন্দ পেয়েছো বলে আমরাও উৎসাহ বোধ করছি।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থেকো সকলে। অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও। জয়হিন্দ।

তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

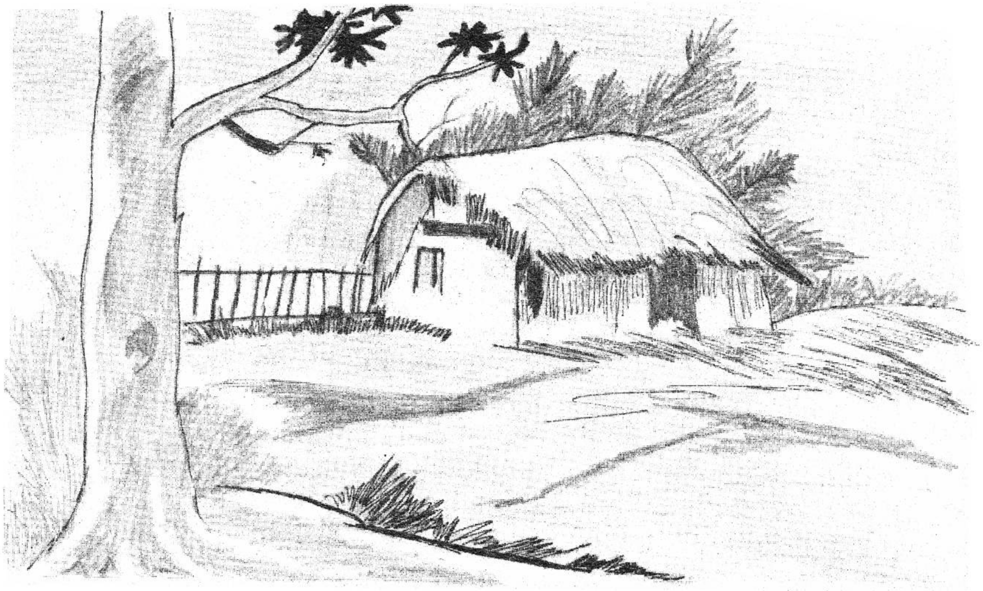

রিশিয়া ঘোষাল, বয়স এগারো, পঞ্চম শ্রেণী, ভারতীয় বিদ্যাভবন, কলকাতা

সবুজ চাষ

পায়ের তলায় সবুজ মাটি
মাথার উপর নীল আকাশ,
মেঘে ভরা সোনালী স্বপ্ন
বৃষ্টিভরা ক্ষীণ বাতাস।
স্বপন রঙের হাওয়ায় দোলে
ও কাদেরই হা-হুতাশ
হীরক রাজার দেশে গেলে
তবে মিটবে মনের আশ।
দিনের আলো নিভল শেষে
নানা রঙের ছড়িয়ে রাশ
এই পৃথিবীর ভরসা মোদের
কৃষক ভায়ের সবুজ চাষ।

সৌরভ দাস,
বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী,
রামকৃষ্ণ মিশন,
পুরুলিয়া

দেবতা

দেবতা, ঠাকুর কেমন জিনিস
দেখতে কভু পেলাম না
পাথর, মাটি, ধাতুর ঠাকুর
কোনটা আসল বুঝি না।
সবাই বলেন, দেবতা আছেন
মসজিদ ও মন্দিরে।
বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন
দেবতা জীবের অন্তরে,
শিবজ্ঞানে তাই জীবের সেবা
করতে বলি সবারে।
নাম, জপ, তপ যতই করো
পাবে নাকো ঈশ্বরে।

মধুরিমা সাউ,
বয়স বারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
মংলামাড়ো মংলা একাডেমি,
মেদিনীপুর

বাঙালীর আছে

বাঙালীর আছে বিশ্বকবি
অমর্ত্য সেন আর সৌরভ
বিজ্ঞানতপস্বী মণি ভৌমিক
সে তো আরেক গৌরব।

বাঙালীর আছে ভাষা আন্দোলন
মাতৃভাষার গর্ব
আকাশ বাতাস পশুপাখি
বাঁচার মাঝেই স্বর্গ।

বাঙালীর আছে বীর বিপ্লবী
বিনয়-বাদল-দীনেশ
বলতে গেলে আরও কত
হয় না যা শেষ!

বাঙালীর আছে শৈল্পিক মন
বিনোদনে তারা সেরা
ছোটদের আছে প্রিয় পত্রিকা
মাসিক শুকতারা।

মানিক সাহা,
বয়স একুশ, বি. এ. দ্বিতীয় বর্ষ,
রানাঘাট কলেজ,
নদীয়া

দেবস্মিতা বসাক, বয়স আঠারো, দ্বাদশ শ্রেণী,
বেথুন কলেজ, কলকাতা

নির্ভীক বিলে

নামটি তার বিলে,
দোল খেত সে চাঁপাগাছে
বন্ধু-বান্ধব মিলে।
একদিন এক বুড়ো,
রামরতন নাম তার
বলল ডেকে সবারে।
বলল বুড়ো, ‘ওরে
ব্রহ্মদত্যি থাকে গাছে,
উঠলে পড়ে ধরে।’
সবাই গেল সটকে,
ব্রহ্মদত্যির হাতে পাছে
ঘাড়খানি যায় মটকে।
তার পরেও বিলে,
একটুও না ভয় পেয়ে
আগের মতোই দোলে।
বলল সবারে ডেকে,
‘বিশ্বাস করিসনে কিছু
নিজে চোখে না দেখে।’

এই ছেলেটি পরে
সর্বস্ব ত্যাগ করলেন
মানব হিতের তরে।
জড়-জাতির দেহে তিনি
দিলেন নতুন ছন্দ
আমাদেরই সবার প্রিয়—
‘স্বামী বিবেকানন্দ’।

মধুমিতা কয়াল,
বয়স ষোল, একাদশ শ্রেণী,
জয়নগর বালিকা বিদ্যালয়,
দঃ ২৪ পরগনা

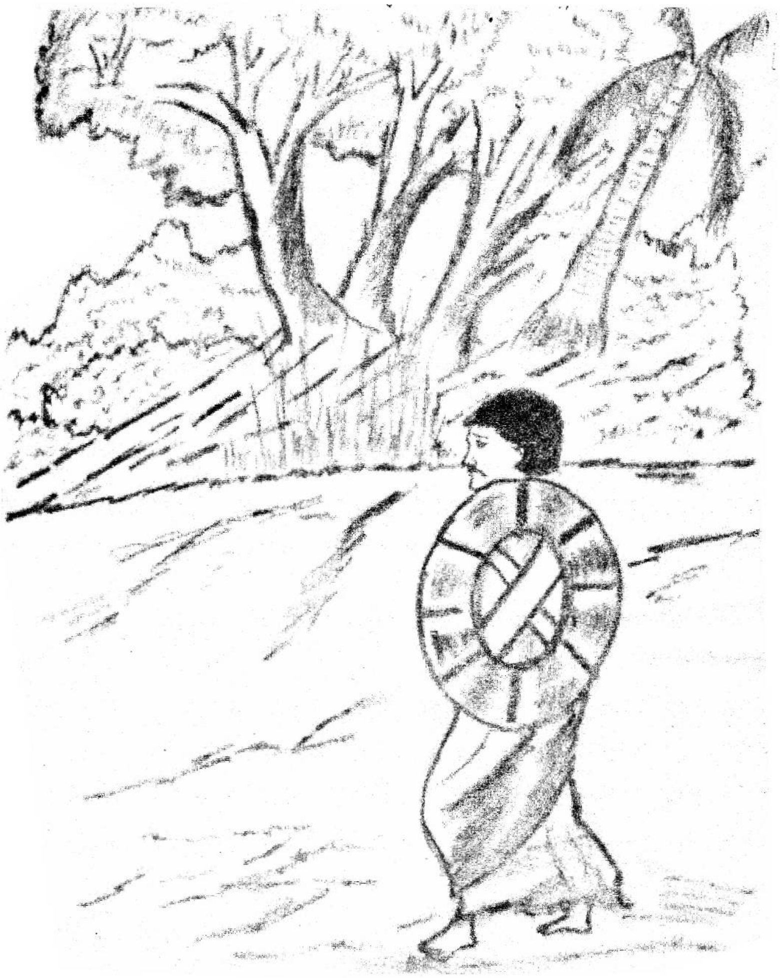

শুভেন্দু চ্যাটার্জী, বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী, নব নালন্দা বিদ্যালয়, কলকাতা

স্বার্থপর

দেবে না কেউ
করবে না কেউ।
শুধু নেবে, নিয়ে যাবে ছিনিয়ে
সবাই শুধু নিজের
নিজের ভাবে।
ভাবে না কেউ পরের তরে।
সবাই ভাবে খারাপটুকু,
ভালোটা খুব কমই ভাবে।
মানুষের এই যে রীতি
পারে কি কেউ পাল্টাতে?

অরিজিৎ ঘোষ, বয়স পনেরো, নবম শ্রেণী, এঃ জিঃ চার্চ স্কুল, উখড়া, বর্ধমান

শুভেন্দু দাস, বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী, কালনা অম্বিকা মহিষমর্দ্দিনী উচ্চ বিদ্যালয়, বর্ধমান

জন্মদিন

আজকে আমার জন্মদিন,
নাচছি তাই তাধিন্ ধিন্।
বন্ধুরা সব এসেছে খেতে
সবাইকে নিয়ে আনন্দে মেতে
‘খেলার ঘরে’ যাই খেলতে,
আনন্দের ডানা মেলতে।
খাবার জন্য মা ডাকেন,
বাবা খুব জোরে হাঁকেন।
বন্ধুরা সব বসল খেতে
দিলাম আমি আসন পেতে।
খাওয়া-দাওয়া শেষ করে—
সবাই এবার ঘরে ফেরে।

উদিতি মুখার্জী,
বয়স দশ, ষষ্ঠ শ্রেণী,
বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়,
রাঁচী

Suk—Apr-5

আমরা বলছি

[বিদ্যালয়-পরিচিতি—জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন কলকাতা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সুখ্যাত স্কুলগুলির একটি। ১৯১৪ সালের ১১ জানুয়ারি স্কুলটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সহ কলকাতার বহু বিদ্বজ্জন উপস্থিত ছিলেন। দেশে এবং বিদেশে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বহু বিশিষ্ট মানুষ এই স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। স্কুলের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা দু'হাজারের কাছাকাছি। অতীতের মতো মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল আজও যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। যেমন, ১৯৯৮ সালে উক্ত দু'টি পরীক্ষায় যথাক্রমে ৯৭.৫ এবং ৯৭.৫৬ শতাংশ ছাত্র উত্তীর্ণ হয়।

অতীতের বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে বিশ্বভারতীর উপাচার্য দিলীপ সিংহ এবং প্রাক্তন পুলিশ প্রধান তুষার তালুকদারও আছেন। বর্তমানে শক্তিপদ চক্রবর্তী স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে রয়েছেন। **সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়**]

প্রথম

মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ধারায় দেখা যায় দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের ইতিহাস। কখনো প্রকৃতির সঙ্গে, কখনো প্রতিবেশী মানুষের সঙ্গে, কখনো বা জীবজন্তুর সঙ্গে সংগ্রাম করে সে তার জয়যাত্রার পথকে অব্যাহত রেখেছে। প্রকৃতির অজস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মানুষ যেদিন আপন প্রতিভার দ্বারা প্রকৃতিকে জয় করার কৌশল আয়ত্ত করেছে, সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

মানুষের মন চিরকালই তার সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে বাইরের প্রশস্ত ক্ষেত্রে নিজেকে প্রকাশিত করতে চায়, এই প্রকাশের জন্যই প্রয়োজন হয় বিশেষ জ্ঞান। বিশেষ জ্ঞানের সন্ধান দেয় বলেই এর নাম 'বিজ্ঞান'। বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তির নিবিড় সম্পর্ক। বিজ্ঞান হলো তথ্য, আর প্রযুক্তি হলো তার প্রয়োগ। বিজ্ঞানীরা তথ্যের আবিষ্কার করেন এবং প্রযুক্তিবিদরা তা প্রয়োগ করে বিশ্ববাসীর নানা অসুবিধা দূর করেন।

প্রাত্যহিক জীবনের নানা প্রয়োজনীয় বিষয় আজ একেবারে হাতের মুঠোয়। আর তা এসেছে প্রযুক্তির মাধ্যমে। সকাল থেকে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত যাবতীয় উপকরণ আমাদের জীবনে প্রয়োজনীয় তার সব কিছুতেই প্রযুক্তির অমোঘ প্রভাব লক্ষ্য করি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আজ আমাদের নিত্য সহচর। আত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যেন একেবারে একান্ত অন্তরঙ্গ রূপে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। আমাদের সমাজে ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না।

এখন দৈনন্দিন জীবনের সব কিছুতেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপস্থিতি। রাস্তাটি তৈরি হয়েছে প্রযুক্তির প্রভাবে। অফিসে আদালতে বাড়িতে পাখা ঘুরছে, টাইপরাইটার মেশিনে কাজ হচ্ছে, পথেঘাটে গাড়ি চলছে—সবই প্রযুক্তির প্রভাবে। দূরদেশের মানুষের সঙ্গে টেলিফোনে কথা চলছে, দূরদেশের সংবাদ চোখের সামনে উপস্থিত হচ্ছে—এসবই সম্ভব হয়েছে প্রযুক্তির মাধ্যমে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত গৃহস্থালীর কাজে প্রযুক্তি নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। সকালে শয্যাত্যাগের বাসনা জাগে অ্যালার্ম ঘড়ির শব্দে। ইলেকট্রিক হিটারে কিংবা গ্যাস ওভেনে চা তৈরি হয়। এরপর সংবাদপত্রে চোখ বুলিয়ে নিতে হয়। তারপর রেডিওতে সংবাদ শোনা। ঘর-গৃহস্থালীর খাবার সমেত নানা জিনিস রেফ্রিজারেটরে থাকে, সেগুলিকে গ্যাস ওভেনে গরম করতে হয়। এ সবই হলো প্রযুক্তির উপকরণ। মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদে এগুলি সৃষ্টি করেছে। অফিসে কম্পিউটার যন্ত্রে হিসাব করা, টেলিফোনে কথা বলা এবং পাখার নিচে বা বাতানুকূল ঘরে কাজ করতে বসে প্রযুক্তির কথাই মনে পড়ে। সন্ধ্যায় রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতিও স্মরণ করিয়ে দেয় প্রযুক্তির কথা। সকালে ব্যবহার্য দাড়ি কামানোর যন্ত্র থেকে, জলের পাইপ, তেল-সাবান, স্নো-পাউডার, আয়না-চিরুনি, ইস্ত্রি করা জামা-প্যান্ট প্রভৃতি প্রযুক্তির দাক্ষিণ্যে পাওয়া গেছে। গ্রামের মানুষদের কাছেও প্রযুক্তি এনে দিয়েছে বিভিন্ন নতুন নতুন যন্ত্রপাতি এবং নব জীবনের স্বাদ। টর্চ, ফাউন্টেন পেন, রাসায়নিক সার, কৃষিকাজের জন্য পাম্পসেট, ধান ভানানোর জন্য হাস্কিং মেশিন, ট্রাক্টর প্রভৃতি এখন সাধারণ মানুষের নিত্য ব্যবহার্য হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তির সহায়তায় মানুষ আজ পুরাতন কৃষিব্যবস্থার ওপর আর নির্ভরশীল নয়।

দৈনন্দিন জীবনে ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন অসামান্য। বৈদ্যুতিক রেলগাড়িতে কিংবা ট্রামে চেপে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলেছি, পাহাড় কেটে রাস্তা বা বসত নির্মাণ করছি, টানেল বা গুহা গড়ে তুলছি, আকাশচুম্বী বাড়িঘর বানাচ্ছি—এসবই আজ আমরা করতে পারছি শুধুমাত্র বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে। চিকিৎসাতেও দেখা দিয়েছে প্রযুক্তির প্রভাব। পেসমেকার যন্ত্র, বিজ্ঞানী রন্টজেনের X-Ray মেশিন প্রভৃতি এর জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

তবে বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে এখনো ঠিকমতো প্রযুক্তির আলো পুরোপুরি পৌঁছয়নি। তাদের কাছে প্রযুক্তি দ্বারা গঠিত বিভিন্ন

অত্যাধুনিক জিনিসপত্র এখনো দুর্লভ। তারা প্রযুক্তির অভাবে সেচের সাহায্যে জল এনে, গরু ও লাঙল দিয়ে নিজেদের জমি চাষ করে। রাত্রিবেলায় তাদের ঘরে জ্বলতে দেখা যায় কেরোসিনের বাতি। আবার অপরদিকে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রযুক্তির সুলভতায় শহরের মানুষ হয়ে উঠছে অকর্মণ্য এবং অলস। তারা হয়ে পড়ছে কর্মবিমুখ।

এই সমস্যাগুলোর প্রতিকার করতে পারলেই মানুষ পৃথিবীতে বসে স্বর্গমহিমা লাভ করবে। প্রযুক্তি আজ সকলের জীবনে এনে দিয়েছে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। জীবনের একঘেয়ে তুচ্ছ প্রাত্যহিকতার মধ্যে এনেছে বৈচিত্র্য ও চিরন্তনতার স্বাদ। কিন্তু এখনও মানুষের অনেক কিছু পেতে বাকি আছে। আশা করা যায় যে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি তা আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দেবে।

সংলীন নরেন্দ্র পাল
অষ্টম শ্রেণী

দ্বিতীয়

প্রাগৈতিহাসিক মানব প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ দেখে ভয় পেয়ে সেদিন লুকিয়েছিল তার নিরাপদ পার্বত্য গুহায়। এই ভয়ের হাত থেকে মুক্তির সাধনাই জন্ম দেয় বিজ্ঞানের। বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকার হাত ধরে আসে যান্ত্রিক সভ্যতা। জন্ম নেয় নতুন নতুন প্রযুক্তি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একে অপরের অগ্রগতিতে সাহায্য করে। প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে আমরা প্রকৃতির পরিবেশকে নিজেদের প্রয়োজনে আজ বদলে নিতে পেরেছি। প্রযুক্তিবিদ্যার অর্থ হলো মানুষের সমস্যাসমূহের সমাধানে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ।

যে ঘড়ি দেখে আমরা ঘুম থেকে উঠি তা উন্নত সভ্যতার এক সফল প্রযুক্তি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন খাদ্যসংগ্রহ, যোগাযোগ, নিত্য প্রয়োজনে এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রণে আমরা প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়েছি।

উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে একই জমিতে বহুবার বিভিন্ন রকম শস্য উৎপাদন করতে পারি। সেই উদ্বৃত্ত শস্য অসময়ের জন্য হিমঘরে রেখে দেওয়া হয়। বাড়িতে রেফ্রিজারেটরের মধ্যে কয়েকদিনের খাদ্য অবিকৃত অবস্থায় রাখতে পারি, ফলে আমাদের পরিশ্রম ও সময় দুইই বাঁচে। যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক সভ্যতার আর এক উল্লেখযোগ্য দিক। জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে ভ্রমণ কতো সহজ হয়ে গেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে। বাস, ট্রেন, জাহাজ, প্লেন সবকিছুতে মানুষ ছুটে চলেছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। প্রকৃতির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ। বর্তমানে সৌরশক্তিকেও কাজে লাগানো হচ্ছে। এছাড়া টেলিভিশন, টেপ রেকর্ডার, রেডিও, টেলিফোন ইত্যাদি পৃথিবীকে ছোট্ট ঘরের মধ্যে এনে দিয়েছে। বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা, বাতানুকূল যন্ত্রের ব্যবহার মানুষের জীবনকে করেছে আরামপ্রদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়।

বিজ্ঞান প্রথমে এসেছিল মানুষের কায়িক শ্রম লাঘব করতে, ফলে যে যন্ত্রের জন্ম হলো তা পৃথিবীতে নিয়ে এল যন্ত্রায়ণ এবং শিল্পবিপ্লব। কিন্তু মানুষ চাইল এমন যন্ত্র আবিষ্কার করতে যা তার মানসিক শ্রম লাঘব করে তাকে দেবে নির্ভাবনাময় জীবনের প্রতিশ্রুতি। এইখানে আমাদের প্রযুক্তির চরম সাফল্য। বর্তমান বিশ্বে নবতম সংযোজন কম্পিউটার। আমাদের শারীরিক-মানসিক সমস্ত কাজই নিখুঁতভাবে সম্পাদন করে পৃথিবীতে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের দুয়ার খুলে দিয়েছে। এই দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের আরও এক যুগান্তকারী আবিষ্কার হলো রোবট। রোবট দূর-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রমানব। তার কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রিত হয় দূর থেকে। মানুষের অসাধ্য কাজকেও সে সম্পন্ন করতে পারে।

উন্নত প্রযুক্তির সাফল্য আজ মেরু অভিযানের দুর্গমতাকেও সহজ করে দিয়েছে। জনহীন ও প্রাণিহীন এই মহাদেশ আয়তনে সুবিশাল। বিজ্ঞানীদের অনুমান ওখানে কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইউরেনিয়াম, সোনা, তামা, সীসা, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি নানা খনিজ সম্পদ প্রচুর পরিমাণে মজুত আছে। 'তুষারবিদারী' জাহাজ দক্ষিণ মেরুর তুষারদেহ ছিন্নভিন্ন করে সেখানে স্থাপন করেছে মানুষের বিজয় পতাকা। ১৯৮২ সালে দক্ষিণ মেরুতে স্থাপিত হয়েছে ভারতের গবেষণাকেন্দ্র। তৈরি হয়েছে সৌরশক্তিচালিত স্বয়ংক্রিয় ও কম্পিউটারযুক্ত আবহাওয়া কেন্দ্র।

বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার প্রযুক্তিবিদ্যাকে আরও জটিল ও উন্নততর করে তুলেছে। প্রতিটি জিনিসের ভাল দিক যেমন আছে তেমনি তার খারাপ দিকও আছে। প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ হয়েছে যান্ত্রিক। একদিন যন্ত্রের উপর ছিল মানুষের প্রভুত্ব। আজ মানুষের উপরেই যেন যন্ত্রের প্রভুত্ব। মানুষের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে অবকাশ, দিয়েছে গতির আনন্দ, বিনষ্ট করেছে হৃদয়বৃত্তির অনুকূল পরিবেশকে। এখন এই প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের সমস্যা তৈরি করবে, না হ্রাস করবে তা নির্ভর করবে আমরা কিভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার করবো তার উপর।

প্রকৃতপক্ষে প্রযুক্তিগত কলাকৌশল যুদ্ধের সময়ে বিপুল ধ্বংসাত্মক ভূমিকা পালন করে। যদি আমরা সদাসতর্ক থাকি তাহলে আমাদের পক্ষে প্রযুক্তিবিদ্যাকে অসৎ পরিকল্পনায় প্রয়োগের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

সায়ন ভট্টাচার্য
সপ্তম শ্রেণী

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সম্পূর্ণ নতুন গল্প, গোয়েন্দা গল্প, ভূতের গল্প, অ্যাডভেঞ্চার, ভ্রমণ, হাসির গল্প, কল্পবিজ্ঞান, কবিতা, কার্টুন, ছড়া, নানা স্বাদের ফিচার ও কমিকস্-এর সংকলন

এতে লিখেছেন :

- অন্নদাশঙ্কর রায়
- অদ্রীশ বর্ধন
- অনীশ দেব
- চণ্ডী লাহিড়ী
- চিত্তরঞ্জন মাইতি
- দুলেন্দ্র ভৌমিক
- নারায়ণ সান্যাল
- নিরঞ্জন সিংহ
- নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
- প্রফুল্ল রায়

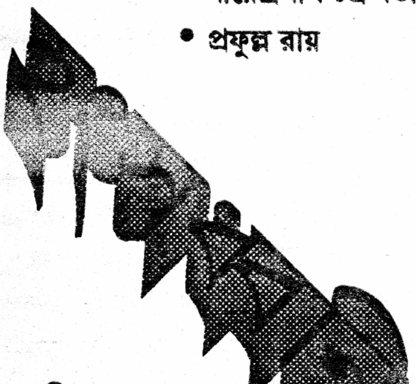

- শক্তিপদ রাজগুরু
- শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
- শৈলেন ঘোষ
- ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
- সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
- সুনির্মল বসু
- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- সুভাষ মুখোপাধ্যায়
- হিমানীশ গোস্বামী

ও আরও অনেকে

শারদপূরণে থাকছে বিশিষ্ট তথ্যবহুল একটি ফিচার—পৃথিবীর বিভিন্ন যুদ্ধের মর্মান্তিক কাহিনী

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ

কলেজ ... কলিকাতা ৭৩

আমরা বলছি

বৈশাখ ১৪০৬ থেকে চৈত্র ১৪০৭ পর্যন্ত যাদের লেখা পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হয়েছে

[তোমাদের সকলকে শুকতারার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। পুরস্কার (৫০০ ও ৩০০ টাকার গিফট ভাউচার) প্রত্যেক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।]

● বৈশাখ, ১৪০৬ → **লরেটো হাউস**

❑ প্রথম : কোয়েল চ্যাটার্জী (নবম শ্রেণী)

❑ দ্বিতীয় : ইমন ভট্টাচার্য (নবম শ্রেণী)

● জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৬ → **পাঠভবন**

❑ প্রথম : রোমিতা ঘোষ (নবম শ্রেণী)

❑ দ্বিতীয় : মুনমুন দেব (নবম শ্রেণী)

● আষাঢ়, ১৪০৬ → **সেন্ট টেরেসা**

❑ প্রথম : নিবেদিতা সাহা (নবম শ্রেণী)

❑ দ্বিতীয় : রণিতা চক্রবর্তী (সপ্তম শ্রেণী)

● শ্রাবণ, ১৪০৬ → **পাঠভবন**

❑ প্রথম : সমৃতা শর্মা (ষষ্ঠ শ্রেণী)

❑ দ্বিতীয় : পৌলমী চট্টোপাধ্যায় (পঞ্চম শ্রেণী)

● ভাদ্র, ১৪০৬ → **সেন্ট টমাস গার্লস স্কুল**

❑ প্রথম : রিমা রায়চৌধুরী (নবম শ্রেণী)

❑ দ্বিতীয় : সায়নী মুখার্জী (সপ্তম শ্রেণী)

● কার্তিক, ১৪০৬ → **হাওড়া হিন্দু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়**

❑ প্রথম : পূজা পাত্র (নবম শ্রেণী)

❑ দ্বিতীয় : হৈমন্তী দে (নবম শ্রেণী)

● অগ্রহায়ণ, ১৪০৬ → **তিলজলা হাই স্কুল**

❑ প্রথম : শমীক কুমার কাঞ্জিলাল (দশম শ্রেণী) ❑ দ্বিতীয় : রাজকুমার পান (একাদশ শ্রেণী)

● পৌষ, ১৪০৬ → **হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন**

❑ প্রথম : অর্ঘ্য পাল (অষ্টম শ্রেণী)

❑ দ্বিতীয় : সুশোভন চক্রবর্তী (অষ্টম শ্রেণী)

● মাঘ, ১৪০৬ → **লবণহ্রদ বিদ্যাপীঠ**

❑ প্রথম : রাহুল সরকার (অষ্টম শ্রেণী)

❑ দ্বিতীয় : শুভময় দাস (অষ্টম শ্রেণী)

● ফাল্গুন, ১৪০৬ → **সালকিয়া এ. এস. হাই স্কুল**

❑ প্রথম : শুভজিৎ দত্ত (একাদশ শ্রেণী)

❑ দ্বিতীয় : কৌশিক দাস (একাদশ শ্রেণী)

● চৈত্র, ১৪০৬ → **গান্ধী কলোনী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়**

❑ প্রথম : অমিত চৌধুরী (নবম শ্রেণী)

❑ দ্বিতীয় : মানবেন্দ্র দে (নবম শ্রেণী)

● বৈশাখ, ১৪০৭ → **আজাদগড় বিদ্যাপীঠ, টালিগঞ্জ**

❑ প্রথম : সুদীপ্ত সাধু (নবম শ্রেণী)

❑ দ্বিতীয় : রাজু ভট্টাচার্য (দশম শ্রেণী)

● জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৭ → **সোদপুর চন্দ্রচূড় বিদ্যাপীঠ**

❑ প্রথম : প্রীতম সিংহ (একাদশ শ্রেণী)

❑ দ্বিতীয় : সুদীপ্ত সাহা (দশম শ্রেণী)

● আষাঢ়, ১৪০৭ → **ভাটপাড়া তারকনাথ বালিকা বিদ্যামন্দির**

❑ প্রথম : ফাল্গুনী নাথ (দশম শ্রেণী)

❑ দ্বিতীয় : রুষা ভট্টাচার্য (দশম শ্রেণী)

● শ্রাবণ, ১৪০৭ → **বোলপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়**

❑ প্রথম : দেবাদৃতা সরকার (সপ্তম শ্রেণী)

❑ দ্বিতীয় : সংগীতা বসু (দশম শ্রেণী)

● ভাদ্র, ১৪০৭ → **বেলেঘাটা শান্তি সংঘ বিদ্যায়তন**

❑ প্রথম : সব্যসাচী চন্দ্র (অষ্টম শ্রেণী)

❑ দ্বিতীয় : সুদীপ সিংহরায় (দশম শ্রেণী)

● কার্তিক, ১৪০৭ → **আজাদগড় বালিকা বিদ্যালয়**

❑ প্রথম : স্বপ্না হাজরা (নবম শ্রেণী)

❑ দ্বিতীয় : মৌপি দাস (নবম শ্রেণী)

● অগ্রহায়ণ, ১৪০৭ → **সোদপুর চন্দ্রচূড় বিদ্যাপীঠ (বালিকা)**

❑ প্রথম : চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (একাদশ শ্রেণী)

❑ দ্বিতীয় : রূপা চক্রবর্তী (একাদশ শ্রেণী)

● পৌষ, ১৪০৭ → **লেকটাউন গভঃ স্পনসর্ড গার্লস হাই স্কুল**

❑ প্রথম : গিনি ভট্টাচার্য (দ্বাদশ শ্রেণী)

❑ দ্বিতীয় : সায়ন্তনী সেন (পঞ্চম শ্রেণী)

● মাঘ, ১৪০৭ → **বারাসত মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল হাই স্কুল**

❑ প্রথম : চিরঞ্জীব গঙ্গোপাধ্যায় (একাদশ শ্রেণী) ❑ দ্বিতীয় : বিজয় লাহিড়ী (নবম শ্রেণী)

● ফাল্গুন, ১৪০৭ → **সোদপুর দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ**

❑ প্রথম : দেবরাজ রায় (দশম শ্রেণী)

❑ দ্বিতীয় : সঞ্জয় পাল (দশম শ্রেণী)

● চৈত্র, ১৪০৭ → **জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন**

❑ প্রথম : সংলীন নরেন্দ্র পাল (অষ্টম শ্রেণী) ❑ দ্বিতীয় : সায়ন ভট্টাচার্য (সপ্তম শ্রেণী)

দ্বিতীয় মাণিক্য

মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায়

[নীতিন আর সতীন্দ্র দু'জনেই অভিজাত পরিবারের ছেলে। তাদের আলাপ হয় এক বন্ধুর বাড়িতে। কিন্তু নীতিনের কাকা শশাঙ্কমোহন পছন্দ করেন না তাদের মেলামেশা। কাকার রাগের হেতু বুঝতে পারে না নীতিন, যেমন পারে না তাদের বাড়িতে হঠাৎ ভূতের উপদ্রবের কারণ ব্যাখ্যা করতে। এইরকম অবস্থায় খুন হন শশাঙ্কমোহন। তদন্তের ভার পড়ে প্রাইভেট ডিটেকটিভ জয়ন্ত বটব্যালের ওপর। তদন্ত চলাকালীন অপহৃত হয় শশাঙ্কমোহনের একমাত্র সন্তান রাজু। ওদিকে পাটনা শহরের রাস্তা থেকে একটি সংজ্ঞাহীন কিশোরকে বাড়িতে তুলে আনেন ডাঃ ব্যানার্জি। জ্ঞান ফিরলেও সে নিজের পরিচয় দিতে পারে না।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রয়ে গেল ছেলেটি ডাঃ ব্যানার্জির বাড়িতে। কিন্তু ছেলেটি যে শিশু নয়—কিশোর। এই বয়সের ছেলেকে মানুষ করা সোজা কথা নয়। ছেলেটির সম্বন্ধে এইটুকু কেবল বুঝতে পেরেছেন ডাঃ ব্যানার্জী যে সে বিহারী নয়, বাঙালী। সামনের বাড়ির বিল্লুকে ডেকে তিনি বললেন, ওর সঙ্গে ভাব করে দেখ তো, যদি পার কোনো খবর বার করতে। ও তোমারই সমবয়সী বলে মনে হয়।

ডাঃ ব্যানার্জি বিল্লুর ডাক্তারদাদু। ছেলেটিও ডাক্তারদাদু বলে ডাকতে শুরু করেছে। নিজের নাম কিছুতেই মনে করে বলতে পারল না। বিল্লু ওর নাম দিল ভুট্টা। হেসেই আকুল হলেন মিসেস ব্যানার্জি। বললেন—ভুট্টা তো ডাকনাম, একটা ভালো নাম দে। বিল্লু বললে, যখন স্কুলে যাবে তখন ওর পোশাকী নাম ঠিক হবে।

এই আরেকটি সমস্যা। ছেলেটির পড়াশুনা কতদূর কে জানে, স্কুল নেবে কিনা তাও ঠিক নেই। ব্রেন ড্যামেজ হয়েছে ওর, অ্যামনেশিয়াতে ভুগছে। স্কুলে দেবার আগে ওর স্মৃতিশক্তি তো ফেরাতেই হবে।

ভুট্টা ভালোই আছে এখানে। মাস চারেক কেটে গেছে ওর পাটনায়। এখনও কিছুই বলতে পারেনি নিজের সম্বন্ধে। ডাঃ ব্যানার্জি পইপই করে বলে দিয়েছেন সে যেন একা বেরোবার চেষ্টা না করে। স্ত্রীকেও তিনি সাবধান করে দিয়েছেন, তিনি যেন অপরিচিত কাউকে বাড়ি ঢুকতে না দেন। কার মনে কি আছে কে বলতে পারে! ড্রাইভার আশরফি বিশ্বস্ত—তবু তাকেও সাবধান করে দিয়েছেন। অনেকেই জেনে গেছে ডাঃ ব্যানার্জির বাড়িতে একটি বাইরের ছেলে থাকে। ডাঃ ব্যানার্জি সকলকে বলেছেন, তাঁর শ্বশুরবাড়ির দিককার এক আত্মীয়ের ছেলে।

ইদানিং টিফিনের সময় বাড়ি আসার পথে বিল্লু লক্ষ্য করছে, একটা লোক ডাক্তারদাদুর বাড়ির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাছাড়া ক'দিন হলো কিছু অপরিচিত লোকের আনাগোনা শুরু হয়েছে ব্যাঙ্ক রোডে। মাঝে মাঝে বিল্লুর

কুকুর মতি চেঁচামেচি করে—তবে সে ওই পর্যন্ত। কিন্তু এই নির্জন দুপুরে ডাক্তারদাদুর বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকা লোকটিকে বিল্লু খুব ভালো মনে গ্রহণ করতে পারল না। ওর চোখ-কান সর্বদা সজাগ, তাই হয়তো সকলকেই ও সন্দেহের চোখে দেখছে। প্রথম দু'তিন দিন সে ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য করেছে। কিন্তু আজ আর নয়।

লোকটাকে যেন দেখতেই পায়নি। আপনমনে সাইকেল থেকে নেমে ফটক খুলে বিল্লু দরজায় বেল দিল। মা দরজা খুলে দিলেন। বিল্লু তাড়াতাড়ি সাইকেল সিঁড়ির তলায় রেখে তরতর করে ওপরে উঠে কাকার বাইনোকুলারটা নিয়ে ছাদে চলে গেল। ছাদে গিয়ে বিল্লু রাস্তার দিকের পাঁচিলের ফুটোয় চোখ রাখল। লোকটা এখন ওদের বাড়ির দিকে মুখ ঘুরিয়েছে। বাইনোকুলারের কাচ ঠিক করে ঘোরাতেই লোকটার মুখ মস্তবড় হয়ে ওর চোখে ধরা পড়ল। নিচুশ্রেণীর মনে হচ্ছে, তবে পোশাক পরেছে বেশ দামী। হঠাৎ বিল্লুর মনে হলো ডাক্তারদাদুর কোনো বিপদ নয় তো? নাকি ভুট্টার খোঁজে এসেছে! তাহলে তো ওকে দেখতেই হচ্ছে ব্যাপারটা কি। লোকটার মুখখানা মনের মধ্যে এঁকে নিল বিল্লু।

দোতলায় এসে বাইনোকুলার ঠিক জায়গায় রেখে বিল্লু খাবার টেবিলে চলে এল। খেতে খেতে বিল্লু ভাবছে, মাকে যদি ব্যাপারটা বলে মা তাহলে আঁতকে উঠবে। ওর কেন জানি মনে হচ্ছে লোকটা বোধহয় ভুট্টাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করছে। কে জানে ভুট্টার রহস্যটা কি। কেবল সেদিন টেলিভিশনে বিলিয়ার্ড খেলা দেখে ওর চোখ দুটো কিরকম কুঁচকে গেল, ভুরু কুঁচকে কি যেন মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। তারপরেই দু'হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরে বললে, মাথায় বড় কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত—ব্যস।

কিরে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছিস কেন? শরীর খারাপ হয়নি তো? উদ্বিগ্ন হয়ে মা জিজ্ঞেস করলেন।

না, আমার কিছুই হয়নি। মনের ভাবনাটাকে জোর করে উড়িয়ে দিয়ে কোনোরকমে খাওয়া শেষ করেই উঠে পড়ল বিল্লু। তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে বাইনোকুলারটা নিয়ে আবার ছাদে গেল। লোকটা ডাক্তারদাদুর বাড়ির পাঁচিলের ওপর হাত রেখে উঁচু হয়ে ভেতরে দেখার চেষ্টা করছে। মনে মনে বিল্লু বললে, আজ তুই নিপাত যাবি।

বাইনোকুলার রেখে নেমে এসে বিল্লু সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। মতির কাছে গিয়ে বললে—চল আমার সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে মতি ল্যাজ নাড়তে নাড়তে চলল। বাগানের ফটক খুলতেই আগে মতি বেরিয়ে পড়ল। তারপর ডাক্তারদাদুর পাঁচিলের গায়ে লোকটাকে দেখেই বিরাট চেঁচামেচি জুড়ে দিল। আচমকা কুকুরের চিৎকারে লোকটা চমকে গিয়ে পাঁচিল ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াতেই বিল্লুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। ধরা পড়ে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে লোকটা পুবমুখো গান্ধী ময়দানের দিকে হাঁটতে শুরু করল। বিল্লু সাইকেল চালিয়ে লোকটাকে ছাড়িয়ে চলে গেল, মতিও ওর সঙ্গে দৌড়তে লাগল। বেশ খানিকটা যাবার পর বিল্লু হঠাৎ সাইকেল ঘুরিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ফিরল। দেখতে পেল লোকটা হনহন করে হাঁটছে। জোরসে চালিয়ে সাইকেলসুদ্ধ বিল্লু লোকটার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। আচমকা সাইকেলের ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে লোকটা হকচকিয়ে গেছে। খুব চোট লেগেছে। পায়ের ওপর দিয়ে সাইকেলের চাকা গড়িয়ে গেছে। বিল্লুর ইশারায় এবার মতি এসে লোকটার কাপড় কামড়ে ধরল। লোকটা ভয়ে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল। মতির মাথায় চাপড় দিতে মতি কাপড় ছেড়ে দিল বটে তবে ঘেউঘেউ করে পাড়া মাত করে তুলল। মতিকে শান্ত করে বিল্লু ময়দানের দিকে এগোল। আর লোকটা ছাড়া পেয়ে ব্যাঙ্ক রোডের মাঝামাঝি বাঁদিকে বাঁক নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি যেতে লাগল।

ময়দানের দিক থেকে ফিরে এসে মতিকে নিয়ে বিল্লুও ওর পিছু নিয়েছে। মতি বিল্লুর সব কথা বোঝে। বিল্লু বলল, আরিব্বাস! মতি দেখ, লোকটা গোলঘরের দিকে এগোচ্ছে। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে আমাদের দেখছে আবার। খুব ঘাবড়ে গেছে, বুঝলি। কিন্তু যতই চেষ্টা করিস আমাকে আর ঠকাতে পারবি না। বিল্লু দেখল, লোকটা গোলঘর ছাড়িয়ে বাঁদিকে ঘুরে বুদ্ধমার্গের একটা বস্তিতে ঢুকে পড়ল। বিল্লু আর এগোল না। মতিকে বলল, মতি, তুই বাড়ি চলে যা। আমি স্কুলে যাচ্ছি। বলেই সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল স্কুলের দিকে। টিফিনের সময় শেষ হয়ে এল বলে। ফার্স্ট বেল বাজছে। বিল্লু হাঁফাতে হাঁফাতে স্কুলে ঢুকে পড়ল।

স্কুল থেকে ফিরে বিল্লু কাউকে আর ডাক্তারদাদুর বাড়ির কাছে দেখতে পেল না। কাকার কলেজ থেকে ফেরার অপেক্ষায় ও ছটফট করতে লাগল। সাড়ে চারটে নাগাদ অজয় দত্ত ফিরলেন। হাতের ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে তিনি বিল্লুকে বললেন, জলদি বৌদিকে বলে আয় আমি শুধু চা খাব। বিল্লু খবরটা মাকে দিয়ে আবার ফিরে এল কাকার কাছে। অজয় দত্ত ইজিচেয়ারের ওপরে ততক্ষণে চোখ বন্ধ করে এলিয়ে দিয়েছেন নিজেকে।

কাকা! বিল্লু ডাকল।

কিরে?

একটা কথা আছে।

মোড়াটা এনে বোস।

কাকার সামনে মোড়া পেতে বসে বিল্লু তড়বড়িয়ে সমস্ত ঘটনাটা বলে ফেলল। অজয় দত্ত বললেন, তাহলে তো ডাঃ ব্যানার্জিকে নিয়ে এখনই থানায় যেতে হয়। একটা ডায়েরি করার দরকার।

ডাঃ ব্যানার্জিকে নিয়ে বেরোতে বেরোতে ওদের সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। অজয় দত্তর গাড়িতেই ওরা কোতোয়ালী পুলিশ স্টেশনে গেল। অফিসার-ইন-চার্জ মিঃ সহায় অফিসেই ছিলেন। অভ্যর্থনা

জানিয়ে বসতে বললেন। বিল্লুকে দেখে একমুখ হেসে বললেন, কী বিল্লুবাবু, আবার কোনো রহস্যের সন্ধান পেলে নাকি? অজয় দত্ত খুঁটিয়ে সব বললেন। মিঃ সহায় বিল্লুকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ঠিক বলছ রোজই দুপুরে লোকটা ডাঃ ব্যানার্জির বাড়ির সামনে দাঁড়ায়?

বিল্লু ঘাড় হেলিয়ে দিল অনেকটা।

একটা ডায়েরি করতে হবে ডাঃ ব্যানার্জি। ভালো কথা তোমার নাম কি বিল্লুবাবু?

স্মরজিৎ দত্ত।

মিঃ সহায় ডায়েরি লেখা শেষ করে বললেন, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তো চলুন আমরা একটা অ্যাডভেঞ্চারে বেরোই।

বেশ তো চলুন, অজয় দত্ত রাজী।

ছেলেটা বাড়িতে একলা আছে। একটু ইতস্তত করলেন ডাঃ ব্যানার্জি।

ভয় নেই, আজ আর কেউ আসছে না। মিঃ সহায় বললেন।

ঠিক আছে চলুন, ডাঃ ব্যানার্জি বললেন।

একটু পরে, আর একটু অন্ধকার নামুক। আমরা কিন্তু বেরোব মিঃ দত্তর গাড়িতেই। বিল্লুবাবু থাকবে আমাদের সঙ্গে। এখন আপনারা কাইন্ডলি পাশের ঘরে গিয়ে একটু অপেক্ষা করুন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে প্লেন ড্রেসে ওদের ঘরে ঢুকে মিঃ সহায় বললেন, আমি রেডি মিঃ দত্ত, চলুন ডাঃ ব্যানার্জি। চল বিল্লুবাবু যাওয়া যাক।

ড্রাইভ করছিলেন মিঃ সহায়। কিছুক্ষণ পরে বিল্লু লক্ষ্য করল গাড়ি চলেছে বুদ্ধমার্গের দিকে। মিঃ সহায় বললেন, আমরা কোথায় চলেছি বলতে পার বিল্লু?

বুদ্ধমার্গের দিকে বস্তির কাছে।

লোকটাকে কি এখন পাব বলে মনে হয়? ডাঃ ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন।

তা বলতে পারব না, তবে দেখা যাক কি হয়।

বস্তির কাছাকাছি এসে মিঃ সহায় গাড়ি পার্ক করলেন। বললেন, রাস্তার আলোয় মোটামুটি লোকজনকে চিনতে পারা যাবে। আমরা খানিকক্ষণ এখানে অপেক্ষা করে দেখি লোকটা বেরোয় কিনা। না হলে অন্য মতলব নিতে হবে। বিল্লু যে ডেরাটা বুদ্ধি করে দেখে নিয়েছে তাতেই আমাদের অনেক কাজ হয়ে গেছে। এই লোকটার ওপর লক্ষ্য রাখলে ডাঃ ব্যানার্জির বাড়ির ছেলেটি কে সেটা হয়তো জানতে পেরে যাব...মুখের কথা শেষ হলো না মিঃ সহায়ের, বিল্লু উত্তেজিতভাবে চাপা গলায় বলল, আরে সাব্বাস্ দুপুরের লোকটা!

বস্তি থেকে দুটো লোক বার হলো। একজন একটু ষণ্ডা গোছের। পরনে শার্ট আর ধুতি। অপর লোকটির পরনে লুঙ্গি ও শার্ট। ধুতিপরা লোকটাকে দেখিয়ে বিল্লু বললে—দুপুরের লোকটা। মিঃ সহায় মিঃ দত্তকে অপেক্ষা করতে বলে গাড়ি থেকে নামলেন। এবার বিল্লুর নজরে পড়ল তাদের গাড়ির পেছনে আরও একখানা প্রাইভেট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, সম্ভবত পুলিশের গাড়ি। মিঃ সহায় পিছনের গাড়িটার কাছে গিয়ে কি সব বলে ফিরে এসে নিশ্চিন্তভাবে বসে বললেন—এবারে আমরা ফিরব। স্টিয়ারিং ধরলেন এবার অজয় দত্ত। বিল্লু দেখল পেছনের গাড়িটা নিঃশব্দে লোক দুটোর পেছনে খুব ধীরে ধীরে যাচ্ছে।

আমাদের সত্যিই ভাগ্যটা ভালো। এভাবে যে লোকটার দেখা পাব ভাবতে পারিনি। একমুখ হেসে মিঃ সহায় বললেন, এই বস্তিটা খুবই কুখ্যাত। চোর, গাঁটকাটা, পকেটমার থেকে প্রফেশন্যাল খুনী পর্যন্ত থাকে এখানে। তবে এই লোকটা চেনা একজন ট্রাক-ড্রাইভার।

ধরছেন না কেন? বিল্লু জিজ্ঞেস করল।

প্রমাণ চাই যে।

অজয় দত্ত কোতোয়ালী পুলিশ স্টেশনে মিঃ সহায়কে নামিয়ে দিয়ে যখন বাড়ি ফিরলেন তখন প্রায় সাতটা।

মাস চারেক প্রায় কেটে গেছে। কোনো খবর নেই রাজুর। রাজুর মামা আর নীতিন উদগ্রীব হয়ে থাকেন যদি কোনো খবর আসে। শ্যামবাজারের বাড়িতে গণেশ মনমরা হয়ে গেছে। ওর প্রাণের রাজু যাকে সে কোলেপিঠে করে মানুষ করল সে আজ থেকেও নেই। রাজুর ঘরে ও কাউকে ঢুকতে দেয় না, বাঘের মতো আগলে বসে থাকে। নিজেই ঘরদোর ঝাড়ে পোঁছে তারপর বন্ধ করে দেয়। আশায় বসে আছে যদি কোনো খবর আসে। পোড়ারমুখো পুলিশ এতদিনেও রাজুকে খুঁজে বার করতে পারল না। অথচ কোলকাতা পুলিশের হারানো লোককে খুঁজে বার করার ব্যাপারে বেশ নামডাক আছে। তবে ভূতের চলাফেরা বন্ধ হয়েছে। ভূতের ভয়ে লোকজনেরা কাজ ছেড়ে দেবে দেবে করছিল। ছোটবাবু মারা যেতেই শোভার মা কাজ ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। পুলিশের হুকুমে যেতে পারেনি। ভূতের উপদ্রব আর না থাকাতে আবার সকলে থেকে গেছে। বাড়ির লোক বলতে এখন কেবল নীতিনদাদা। বড়বাবু, বড় মা ঠাকরুণ, ছোট মা ঠাকরুণ, ছোটবাবু সবাই চলে গেলেন। রাজুও হারিয়ে গেল। রয়েছেন শুধু নীতিনদাদা। তিনিও যাবেন—হয় কেউ মারবে নয়তো রাজুর মতোই হারিয়ে যাবেন।

চোখের জল মোছে আর ভাবে গণেশ। ওর আকুল অনুরোধে নীতিন আজকাল কাকামণির শোবার ঘরে শোয়। গণেশ আগের মতোই রাজুর ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে শোয়। ওর ধারণা ভূত আবার আসবে। আর এবার এলে সে চেপে ধরবেই ভূতকে। পুলিশবাবুর সঙ্গে যে টিকটিকিবাবু এসেছিল—সে বলেছিল, মানুষ ভূত। ছোটবাবুকে কে মেরেছে তাকে ও খুঁজে বার করবেই।

(চলবে)

ছবিঃ সুফি

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

আই এন্ড ইয়ার হসপিটালের ইয়ান ফ্লিট ব্রুকট Pirenzepine নামে একটি ওষুধকে মায়োপিয়ার সবচেয়ে ভালো ওষুধ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ওষুধটা অনেকদিন ধরেই ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে আমেরিকায় ৮ থেকে ১২ বছর বয়স্ক চব্বিশজন মায়োপিয়ায় আক্রান্ত শিশুকে Pirenzepine eye gel দিয়ে পরীক্ষামূলক চিকিৎসা করা হচ্ছে। তারা অনেকটা সুস্থ। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই সবাই পুরোপুরি সুস্থ হলেই এই চোখের ওষুধটা বাণিজ্যিক ভাবে বাজারে ছাড়া হবে। তখন লেন্স আর চশমার জায়গা হবে ডাস্টবিনে।

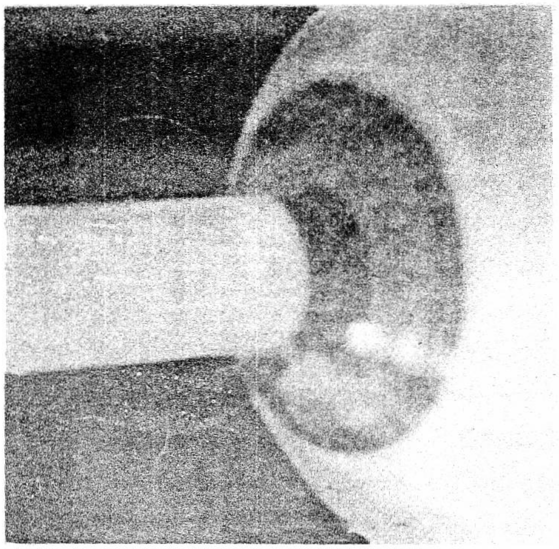

মায়োপিয়া সারাতে লেসারের প্রয়োগ চলছে।

মায়োপিয়া দূর হটো

ক্ষীণ দৃষ্টি বা মায়োপিয়া চোখের সবচেয়ে কষ্টকর অসুখ। যা মাইনাস লেন্স দিয়ে সঠিকভাবে দেখার ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু তাতে সমস্যা কমে না। কেবলই দৃষ্টিক্ষীণতা বাড়তে থাকে। ফলে বাড়াতে হয় লেন্সের পাওয়ার। চোখে ওঠে পুরু থেকে পুরু লেন্সের চশমা। তাছাড়া মায়োপিয়া বা ক্ষীণ দৃষ্টিধারীদের গ্লুকোমা ও রেটিনার ডিটাচমেন্টের আশংকা থাকে, যা থেকে নেমে আসে পুরোপুরি অন্ধত্ব। বিজ্ঞানীরা এখন মায়োপিয়া সারানো এবং তার বৃদ্ধি রোধের উপায় বার করে ফেলেছেন। যায় তার অন্যান্য উপসর্গগুলোও দূর হবে। মায়োপিয়ায় আক্রান্তকারীদের চোখের রেটিনা পর্যন্ত দৃশ্যমান বস্তুর ছবি বা তা থেকে নিঃসৃত আলো পৌঁছাতে পারে না। রেটিনার আগেই কোনো একটা বিন্দুতে আলোকরশ্মিগুলি মিলিত হয়ে প্রতিবিম্ব তৈরি করে। ফলে অপটিক নার্ভ বাহিত হয়ে বস্তুর ধারণা মস্তিষ্কে পৌঁছায় না এবং দেখতে পায় না। লেন্স ব্যবহার ছাড়াও চোখ নিজে নিজে অনেক সময় চক্ষুর পেশীগুলির আয়তন পরিবর্তন করে প্রসারণ ঘটিয়ে দেখতে সাহায্য করে। যাকে উপযোজন বলে। আর এর ফলেই চোখের আরো ক্ষতি হয়। কারণ বারবার উপযোজনে পেশীগুলির ক্লান্তি আসে। সেগুলি আর কার্যকর থাকে না। বর্তমানে লেসার-এর সাহায্যে ব্যয়বহুল চিকিৎসায় কিছুটা উপযোজন করা হয়।

এসব স্থান থেকে বিজ্ঞানীরা মায়োপিয়ার ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টায় গবেষণা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের সাহায্য করেছে বেলেডোনাপ্রাপ্ত অ্যাট্রোপিনের ব্যবহারিক জ্ঞান। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দের আগে থেকেই চক্ষু বিস্ফারিত করতে এবং পেশীর প্রসারণের কাজে চোখে অ্যাট্রোপিন ব্যবহার করা হতো। কিন্তু অ্যাট্রোপিনের অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। অ্যাট্রোপিন ব্যবহারের পর তীব্র আলোকে চোখ কাজ করতে পারে না। এসব কারণে অ্যাট্রোপিন বাতিল করে অন্য ওষুধের খোঁজ চলল। ডবলিনের রয়াল ভিক্টোরিয়া

কচুরিপানা থেকে প্রস্তুত হয় প্রোটিনসমৃদ্ধ দই।

কচুরিপানায় প্রোটিন

কচুরিপানা যাকে বলে ওয়াটার হায়াসিন্থ, সবচেয়ে ক্ষতিকারক জলজ উদ্ভিদ। যদিও এতে সুন্দর বেগুনী ফুল ফোটে তবু এ উদ্ভিদ কোনো কাজের নয়। গত একশ বছরে ভারত, চীন, অস্ট্রেলিয়াসহ তিপ্পান্নটি দেশ এর দ্বারা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জলাশয়ের জল, মাছ নষ্ট করে, জলযান চলাচলে বাধা দেয়, এমনকি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইনকেও অচল করে দেয়। মশা-মাছি এতে বংশবিস্তার করে। এদের বাড়বাড়ন্ত সহজে কমানো যায় না। এসব ভাবতে ভাবতেই গ্রেট ব্রিটেনের ডঃ গ্লিন ডেভিসের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী আলফা আলদা ঘাস থেকে যেভাবে প্রোটিনসমৃদ্ধ দই তৈরি করা হয় ঠিক সেভাবেই কচুরিপানা থেকে প্রোটিনসমৃদ্ধ দই প্রস্তুত করেছেন, যা মানুষের কাছে খুবই উপাদেয় এবং পুষ্টিকর। দই তৈরির এই পদ্ধতিতে উপজাত হিসেবে যে শুকনো পাতাগুলো পাওয়া যায় সেগুলো গবাদি পশুর ভালো খাবার।

নাট্যে কথামৃত

জ্যোতিভূষণ চাকী

তাঁরই দান

[স্থানীয় মঠের একজন সাধু ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন গ্রামের জমিদারবাবু বেদম মারছেন একজন লোককে]

সাধু—করেন কী, করেন কী, জমিদারবাবু! অমন করে ওই নিরীহ লোকটাকে মারছেন কেন?

জমিদার—নিরীহ! ব্যাটা ভেজা বিড়াল!

[মারতেই থাকেন]

খাজনা বাকি চার সনের, দেবার নামটি নেই। ওদিকে বাবুর ঘরের চালা পড়ছে।

লোকটি (কাঁদতে কাঁদতে)—আজ্ঞে বাবুমশায়, জল পড়ে ঘরে। তিষ্ঠনো দায়। তাই ধারদেনা করে চালাটা—

জমিদার—তা ধারদেনা করে খাজনাটা দিচ্ছ না কেন চাঁদু!

[প্রচণ্ড মারতে থাকেন]

সাধু—অমন করে মারলে যে লোকটি মরে যাবে।

জমিদার—মরুক। [মারতেই থাকেন]

[সাধু এবারে বাধা দিতে যান]

জমিদার—তুমি নাক গলাতে আসছ কেন?

সাধু—এ আমার ধর্ম যে।

জমিদার—এঁ ধর্ম! যত সব ভণ্ড এসে জুটেছে, আখড়াই তুলে দেব।

[সাধু কোনো কথা কানে না নিয়ে লোকটাকে আড়াল করতে চেষ্টা করেন। মারটা গিয়ে পড়ে সাধুর উপরে]

সাধু—অভাবী গরিব মানুষটাকে না মেরে আমাকে মারুন, সে-ও ভালো।

জমিদার (রেগে গিয়ে)—তোকেই মারব।

[চাবুক চালাতে লাগলেন। সাধু নীরবে মার খেয়ে চললেন। তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। জমিদার চলে গেলেন]

লোকটি—যাই মঠে গিয়ে খবর দিইগে।

[লোকটির প্রস্থান]

[কয়েকজন সাধু এসে পড়েছেন। অন্য দু-একজন লোকও সেখানে এসে পড়েছে। সাধুরা জলের ঝাপটা দিচ্ছেন]

সাধু ১—একটু দুধ পেলে ভালো হতো।

গ্রামবাসী ১—আমি এক্ষুণি দুধ আনছি।

[দুধ এল]

সাধু ২—এটুকু খাইয়ে দেবার চেষ্টা করি।

[খাওয়াতে চেষ্টা করেন। আহত সাধু জ্ঞান ফিরে পান]

সাধু ২—তুমি আমাকে চিনতে পারছ? কে দুধ খাওয়াচ্ছে বলো তো?

আহত সাধু—যিনি মেরেছেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।

[বিবেকের প্রবেশ]

বিবেক—আহত সাধুটি সুখদুঃখকে সমানভাবেই গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বর আঘাত করেন আবার তিনিই সোহাগ করেন। তাই সাধুটি আঘাতকে অভিশাপ বলে মনে করেননি। ঈশ্বরপ্রাণ মানুষটি ধর্মের সারতত্ত্ব বুঝেছেন।

[বিবেকের প্রস্থান]

স্টিভের অশ্বমেধের ঘোড়া থামিয়ে দিয়েছেন সৌরভ

শা.প্রি.ব

স্টিভ ওয়ার অশ্বমেধের ঘোড়া থামিয়ে দিয়েছে সৌরভ বাহিনী। পর পর ১৬টি টেস্টে জেতার পর কলকাতায় এসে হোঁচট খেলো অস্ট্রেলিয়া। সেই সঙ্গে এ কথা আরও একবার প্রমাণিত হয়ে গেল, 'ক্রিকেট ইজ অ্যা গেম অফ গ্লোরিয়াস আনসার্টেনটি'।

ইডেনে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে বিজয়লক্ষ্মী একবার অস্ট্রেলিয়ার দিকে ঝুঁকেছেন তো পরমুহূর্তে আবার তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে দুরন্ত-দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছেন কখনো হরভজন সিং (ইডেনে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম এবং ভারতীয়দের মধ্যেও প্রথম হ্যাটট্রিক করেছেন), কখনো ভি ভি এস লক্ষ্মণ (একটুর জন্য তিনশ রান করতে পারেননি) কখনো বা রাহুল দ্রাবিড় (মাত্র ক'রানের জন্য ডবল সেঞ্চুরি করতে ব্যর্থ)। এঁদের সঙ্গে দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং-এ মানানসই হয়ে উঠেছিলেন শচীন তেন্ডুলকার। এঁরা চারজনে মিলে হারিয়ে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়াকে। সেই সঙ্গে অবশ্যই প্রশংসা করতে হবে সৌরভ গাঙ্গুলির দল পরিচালনাকেও। লক্ষ্মণকে ব্যাটিং অর্ডারে তুলে এনে তিনি যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন কিংবা খেলার পঞ্চম দিন যেভাবে ফিল্ডিং সাজিয়ে আর বোলার বদল করে অস্ট্রেলিয়াকে চেপে ধরেছিলেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অস্ট্রেলিয়া যখন ইডেনে ভারতকে ফলো অন করালো তখন তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে শেষ পর্যন্ত তারা হারবে। এ

যেন মহামতি ভীষ্মের শরশয্যা থেকে উঠে দাড়িয়ে লক্ষ্মণের রূপ ধরে অস্ট্রেলিয়দের সংহার করা। লক্ষ্মণকে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা এমনিতেই সমীহ করে। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে তাঁর সেই ১৬৭ রানের ইনিংসটির কথা ওঁরা এতদিনেও ভুলতে পারেননি। এবার সেই ইনিংসটির কথা লক্ষ্মণ নিজেই ভুলিয়ে দিলেন ইডেনে তিনশ ছুঁই ছুঁই রান করে। রাহুল দ্রাবিড়ও খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাই শচীনের ব্যর্থতা, সৌরভের বড় ইনিংস গড়ার পথে পা বাড়িয়েও আউট হয়ে যাওয়ার চাপ খুব একটা অনুভূত হয়নি। কারণ লক্ষ্মণ আর রাহুল ভারতকে জেতার মতো জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন।

যে কোনো পিচে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করা রীতিমতো কষ্টকর। যদিও ভারতের বোলিং যথেষ্ট দুর্বল। শ্রীনাথ, আগারকার, কুম্বলের মতো তিনজন নির্ভরযোগ্য বোলার দলে নেই। তাই পঞ্চম দিনে দলনেতা সৌরভের ওপর কিছুটা বাড়তি চাপ ছিল। তবে তাঁকে কিছুটা নিশ্চিন্তে রেখেছিলেন হরভজন আর জাহির খাঁ। ছোটবাবু শচীনকেও যে দরকারের সময় কাজে লাগাবেন তাও ঠিক করে রেখেছিলেন। তাই অস্ট্রেলিয়া যখন প্রচণ্ড চাপের মধ্যে দ্বিতীয়বার ব্যাট করতে নামল তখন সৌরভ প্রত্যেকটি পা ফেলেছেন হিসেব করে। বোলার বদল থেকে ফিল্ডিং সাজানোয় তিনি দিয়েছেন দূরদর্শিতার পরিচয়। তারই নিট ফল দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের ১৭১ রানে জয়। ভারত এর আগে কখনো ফলো অন করে কোনো টেস্ট জেতেনি। এ এক নতুন নজির।

নজির গড়ার দিক দিয়ে ইডেন এবার সকলকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। প্রথমে হরভজন সিংয়ের হ্যাটট্রিক, তারপর লক্ষ্মণের ভারতীয়দের মধ্যে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ স্কোর, পঞ্চম উইকেটে রেকর্ড রান, গাভাসকারকে ডিঙিয়ে যাওয়া, শেষ পর্যন্ত

টেস্ট জয়—কলকাতার এই টেস্ট ম্যাচকে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে ঐ খেলাটির কথা বড় বড় হরফে লেখা থাকবে। কারণ ফলো অনের ধ্বংসস্তূপ থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে জেতাটাই যে স্মরণীয় ঘটনা। সহজে যা ঘটে না।

কলকাতা টেস্টের আগে মাত্র দু'বার কোনো দল ফলো অন করেও জিতেছে। সব থেকে মজার কথা এবারেরটি নিয়ে তিনবারই হার মানতে হয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। নিচে সেই তিনবারের খতিয়ান দেওয়া হলো ঃ

১৮৯৪-৯৫ সাল ঃ ইংলন্ড—৩২৫ ও ৪৩৭

☐ অস্ট্রেলিয়া—৫৮৬ ও ১৬৬

ইংলন্ড ১০ রানে জয়ী।। খেলা সিডনিতে

১৯৮১ সাল ঃ ইংলন্ড—১৭৪ ও ৩৫৬

☐ অস্ট্রেলিয়া ৯উইঃ ডিঃ ৪০১ ও ১১১

ইংলন্ড ১৮ রানে জয়ী।। খেলা হেডিংলেতে

২০০১ সাল ঃ ভারত—১৭১ ও ৭ উইঃ ডিঃ ৬৫৭☐ অস্ট্রেলিয়া—৪৪৫ ও ২১২

ভারত ১৭১ রানে জয়ী।। খেলা ইডেনে

এক নজরে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

কলকাতার ইডেন উদ্যানে ভারতের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার এবারের খেলাটি ছিল সপ্তম সাক্ষাৎকার। এর আগের ৬টি টেস্টের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া দুটি এবং ভারত একটি টেস্টে জিতেছে। ভারত জিতেছিল এবারের ঠিক আগের টেস্ট ম্যাচটিতে। খেলা হয়েছিল ১৯৯৭-৯৮ সালে মার্চ মাসের ১৮-২১ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ চারদিনেই খেলাটি শেষ হয়ে গিয়েছিল। নিচে এবারের আগের ছ'টি টেস্ট ম্যাচের সংক্ষিপ্ত ফলাফল দেওয়া হলো ঃ

১৯৫৬-৫৭ (২-৬ নভেম্বর)

অস্ট্রেলিয়া ঃ ১৭৭ রান (ইয়ান ক্রেগ ৩৬, পিটার বার্জ ৫৮; গোলাম আমেদ ৪৯ রানে ৭) ও ৯ উইঃ ১৮৯ (নিল হার্ভে ৬৯, কেন ম্যাকাই ২৭, রেলিন্ডওয়াল ২৮; গোলাম আমেদ ৮১ রানে ৩, ভিনু মানকড় ৪৯ রানে ৪)

ভারত ঃ ১৩৬ রান (নরি কন্ট্রাক্টর ২২, বিজয় মঞ্জরেকার ৩৩; লিন্ডওয়াল ৩২ রানে ৩, রিচি বেনো ৫২ রানে ৬) ও ১৩৬ রান (পলি উমরিগড় ২৮, পঙ্কজ রায় ২৪, ভিনু মানকড় ২৪, রিচি বেনো ৫৩ রানে ৫)

অস্ট্রেলিয়া ৯৪ রানে জয়লাভ করে

১৯৫৯-৬০ (২৩-২৮ ফেব্রুয়ারি)

ভারত ঃ ১৯৪ (নরি কন্ট্রাক্টর ৩৬, পঙ্কজ রায় ৩৩, সি ডি গোপীনাথ ৩৯) ও ৩৩৯ (এম. এল. জয়সীমা ৭৪, চান্দু বোরদে ৫০, রামনাথ কেনি ৬২; রিচি বেনো ১০৩ রানে ৪)

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৩৩১ (গ্রাউট ৫০, নরম্যান ও'নিল ১১৩, বার্জ ৬০; রমাকান্ত দেশাই ১১১ রানে ৪) ও ২ উইকেটে ১২১ (ফ্যাভেল ৬২ অপঃ)

খেলা ড্র

১৯৬৪-৬৫ (১৭-২২ অক্টোবর)

অস্ট্রেলিয়া ঃ ১৭৪ (বিল লরি ৫০, ববি সিম্পসন ৬৭, ইয়ান রেডপাথ ৩২ নঃ আঃ; সেলিম দুরানী ৭৩ রানে ৬) ও ১ উইঃ ১৪৩ (লরি ৪৭ নঃ আঃ, সিম্পসন ৭১)

ভারত ঃ ২৩৫ (দিলীপ সারদেশাই ৪২, জয়সীমা ৫৭, বোরদে ৬৮ নঃ আঃ; সিম্পসন ৪৫ রানে ৪ উইঃ, টম ভিভার্স ৮১ রানে ৩)

খেলা ড্র ☐ বৃষ্টির জন্যে শেষ দু'দিন খেলা হতে পারেনি

১৯৬৯-৭০ (১২-১৬ ডিসেম্বর)

ভারত ঃ ২১২ (বিশ্বনাথ ৫৪, সোলকার ৪২; গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি

সেঞ্চুরি করার পরে উল্লসিত গিলক্রিস্ট।

৬৭ রানে ৬) ও ১৬১ (অজিত ওয়াদেকার ৬২; এরিক ফ্রিম্যান ৫৪ রানে ৪; অ্যালান কনোলি ৩১ রানে ৪)

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৩৩৫ (ইয়ান চ্যাপেল ৯৯, ওয়ালটার্স ৫৬; বিষেণ সিং বেদী ৯৮ রানে ৭) ও বিনা উইঃ ৪২ রান।

অস্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে জয়ী

১৯৭৯-৮০ (২৬-৩১ অক্টোবর)

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৪৪২ (গ্রাহাম ইয়ালপ ১৬৭, অ্যালান বর্ডার ৫৪, কিম হিউজ ৯২, রুস ইয়ার্ডলে ৬১ নঃ আঃ; কপিলদেব ৭৪ রানে ৫, দিলীপ দোশি ৯২ রানে ৪) ও ৬ উইঃ ১৫১ ডিঃ (হিউজ ৬৪ নঃ আঃ)

ভারত ঃ ৩৪৭ (দিলীপ বেংসরকার ৮৯, বিশ্বনাথ ৯৬; ইয়ার্ডলে ৯১ রানে ৪) ও ৪ উইঃ ২০০ (চেতন চৌহান ৫০, যশপাল শর্মা ৮৫ নঃ আঃ; জিওফ ডিমক ৬৩ রানে ৪)

খেলা ড্র

১৯৯৭-৯৮ (মার্চ ১৮-২১)

অস্ট্রেলিয়া ঃ ২৩৩ (স্টিভ ওয়া ৮০, পন্টিং ৬০; শ্রীনাথ ৮০ রানে ৩, সৌরভ গাঙ্গুলি ২৮ রানে ৩, অনিল কুম্বলে ৪৪ রানে ৩) ও ১৮১ রান (মার্ক টেলর ৪৫, স্টিভ ওয়া ৩৩, হেইলিং ৩৮; অনিল কুম্বলে ৬২ রানে ৫)

ভারত ঃ ৫ উইঃ ৬৩৩ (ভি ভি এস লক্ষ্মণ ৯৫, নভজ্যোৎ সিং সিধু ৯৭, রাহুল দ্রাবিড় ৮৬, শচীন তেন্ডুলকার ৭৯, আজহারউদ্দিন ১৬৩ নঃ আঃ, সৌরভ গাঙ্গুলি ৬৫)

ভারত এক ইনিংস ও ২১৯ রানে জয়ী

সর্বোচ্চ

ভারত ঃ ৫ উইঃ ৬৩৩ ডিঃ—১৯৯৭-৯৮

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৪৪২—১৯৭৯-৮০

সর্বনিম্ন

ভারত ঃ ১৩৬—১৯৫৬-৫৭

অস্ট্রেলিয়া ঃ ১৭৭—১৯৫৬-৫৭

ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ

ভারতের পক্ষে ঃ মহম্মদ আজহারউদ্দিন ১৬৩ নঃ আঃ—১৯৯৭-৯৮

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ ঃ গ্রাহাম ইয়ালপ ১৬৭—১৯৭৯-৮০

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

ভারত ঃ	৪৯ রানে ৭	গোলাম আমেদ ১৯৫৬-৫৭
	৯৮ রানে ৭	বিষেণ সিং বেদী ১১৬৯-৭০
অস্ট্রেলিয়া ঃ	৫২ রানে ৬	রিচি বেনো ১১৫৬-৫৭

কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টের আগে পর্যন্ত ভারত ও অস্ট্রেলিয়া মোট ৫৮টি টেস্ট খেলেছে। তার মধ্যে ভারত জিতেছে ১১টিতে, অস্ট্রেলিয়া ২৯টিতে, ১৭টি টেস্ট শেষ হয়েছে অমীমাংসিতভাবে। দু'দেশের একটি টেস্ট টাই হয়েছে।

সব দেশের সঙ্গে মিলিয়ে ভারত মোট ৩৩৭টি টেস্ট খেলেছে। তার মধ্যে জিতেছে ৬৩টিতে, হেরেছে ১১৩টি টেস্টে, ড্র করেছে ১৬০টি খেলায়। বাকি একটি খেলা টাই।

অস্ট্রেলিয়া খেলেছে ৬১২টি টেস্ট, জিতেছে ২৬৬টি টেস্টে, হার মেনেছে ১৬৮টি খেলায়, ১৭৬টি টেস্ট শেষ করেছে অমীমাংসিতভাবে। ২টি টেস্ট টাই হয়েছে।

(ভারত-অস্ট্রেলিয়ার কলকাতা টেস্টের আগে পর্যন্ত)

ছেলেবেলার গল্প

হাতে ক্রিকেট স্টাম্পের মতো একটা ডাণ্ডা। সেটা বাঁ হাতে নিয়ে সজোরে ছোট্ট বলটা ছুঁড়ে দিলো জলের ট্যাঙ্কের লাগোয়া দেওয়ালের দিকে। বলটা ফিরে আসতে আসতেই ডাণ্ডা চলে গেছে ডান হাতে। এবার সেই ফিরতি বলটাকে ডাণ্ডা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মার। বল গিয়ে দেওয়ালে লেগে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার মার। বাচ্চা ছেলেটা সারাক্ষণই একা একা ঐভাবে খেলছে। নিজের মনে খেলে। বাড়ির সকলে জানেন, সে কোথাও যাবে না। সারাদিন একটা ডাণ্ডা আর একটা বল নিয়ে ওখানেই পড়ে থাকবে। তাই বড়রা নিশ্চিন্ত।

সিডনি শহর থেকে আশি মাইল দূরে বাউরাল। ছোট্ট একটা শহর। বাড়ির

সকলের সঙ্গে ছেলেটি সেখানে চলে এসেছে মাত্র ৩ বছর বয়সে। বারো বছরের বড় দাদা ভিক্টর ওর সঙ্গে খেলে না। দিদিরা আরও বড়। তাই সে বড় নিঃসঙ্গ। আর সেইজন্যেই ঐ জায়গাটা সে বেছে নিয়েছিল। বাড়ির পেছনে জলের ট্যাঙ্কের সামনের বাঁধানো জায়গাটা ওর খেলার মাঠ। খেলোয়াড় বলতে ও একাই। কিন্তু তাবলে বল ফসকানো চলবে না, ফসকালেই বল কুড়োতে যেতে হবে অনেক দূরে।

আর একটু বড় হতেই ছেলেটিকে ভর্তি করে দেওয়া হলো বাউরালের ইন্টার-মিডিয়েট স্কুলে। স্কুলে খেলাধুলার তেমন চল ছিল না। ছুটির দিনেও তাই সে একা একা ক্রিকেট খেলতো। যে বলটা মারতে পারতো না সেই বলটা চিলের মতো ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে জলের ট্যাঙ্কের দেওয়ালে ছুঁড়ে মারতো। ফলে একই সঙ্গে ব্যাটিং আর ফিল্ডিং করার অভ্যেস হয়ে যেত।

এইভাবেই একটু একটু করে বড় হয়ে উঠতে লাগলো ছেলেটি। কেউ জানতো না তার এই দক্ষতার কথা। জানা গেল যখন ১১ বছর বয়সে সে তার জীবনের প্রথম ম্যাচটি খেললো। খেলাটা হয়েছিল বাউরালের গ্লোব পার্কে। সেই খেলায় সে ৫৫ রান করেছিল। পরে ঐ মাঠের নাম বদলে তার নামে রাখা হয়। গ্লোব পার্ক এখন ব্রাডম্যান ওভাল নামে পরিচিত।

পরের বছর থেকেই ছোট্ট ডনের জীবন ধীরে ধীরে বদলে যেতে শুরু করলো।

সেদিন খেলা ছিল লিটাগাংয়ের স্কুলের সঙ্গে। ম্যাটিং উইকেটে খেলা। সেই খেলায় ডন তার জীবনের প্রথম সেঞ্চুরিটি করলো। ম্যাচও জিতলো তারা। কিন্তু আনন্দের চোটে স্কুলের ব্যাট লিটাগাংয়ের মাঠেই ফেলে চলে এলো। সে ব্যাট আর ফেরত পাওয়া গেল না।

ব্যাট হারিয়ে স্কুলে ফেরায় হেডমাস্টারমশাই রেগে টং। জিজ্ঞেস করলেন, কে ব্যাট করছিল?

ডন স্যার। ও নট আউট ছিল।

ডন, ব্যাটটা কোথায়? সেঞ্চুরি করেছো খুব ভালো কথা। কিন্তু ব্যাট কোথায় রেখে এসেছো?

ডন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বলতে পারছে না, সেঞ্চুরি করার আনন্দে ব্যাট নিয়ে আসতে সে ভুলে গেছে। তাই জীবনের প্রথম সেঞ্চুরি করার পর প্রচণ্ড বকুনি খেতে হয়েছিল ডনকে।

পরের ম্যাচে ডন করলো অপরাজিত ৭২ রান।

বাউরালের একটা ক্রিকেট দল ছিল। সেই দলের ক্যাপ্টেন ডনের মামা। খেলার সুযোগ সে বিশেষ পেত না কিন্তু স্কোরারের কাজটা ছিল তার পাকা। কোথায় ব্যাট দিয়ে বল পেটাবে—তা না বসে বসে শুধু স্কোর লেখা। একদম ভালো লাগে না ডনের। বিরক্তও হয়। এই সময়ই সিডনিতে ইংলন্ডের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ম্যাচ পড়লো। ডনের বাবা খেলা দেখতে যাবেন। সে সুযোগ কী ডন ছাড়তে পারে? বাবাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করিয়ে সেও চললো সিডনিতে। দু'দেশের পঞ্চম টেস্ট ম্যাচটি দেখতে।

সিডনির মাঠে ঢোকার পর চোখের পলক যেন পড়ে না ডনের। খেলার প্রতিটি মুহূর্ত সে যেন গিলতে থাকে। ইচ্ছে করে, ছুটে গিয়ে ঐ মাঠে নেমে পড়ে খেলতে। খেলার শেষে বাবার হাত ধরে বাড়ি ফিরছে ডন। সে তখন একটা ঘোরের মধ্যে আছে।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, খেলা কেমন লাগলো, বললি না তো?

দেখো বাবা, আমি একদিন ঐ মাঠে খেলবো।

হেসে উঠলেন ডনের বাবা। বললেন, বড় বড় খেলোয়াড়রাই শুধু এই মাঠে খেলেন। তুই খেলবি কী করে?

দেখো, আমি ঠিক খেলবো। খেলতে আমায় হবেই।

দু'তিন বছরের মধ্যেই ডন বাউরাল দলের নিয়মিত খেলোয়াড় হয়ে গেল। পাশের শহর উইনজেলোর সঙ্গে ডনদের খেলা। দু'দলের মধ্যে ভীষণ রেষারেষি। উইনজেলো দলে একটি ছেলে দারুণ স্পিন বল করে। কেউ তার বলে খেলতে পারে না। বিল ওরিলির নাম তাই বাউরালের সকলেই জানে। ডন এবার প্রথম বিলের বিরুদ্ধে খেলবে। তা নিয়েই কথা হচ্ছিল মার সঙ্গে। মা বললেন, বিল তোদের শেষ করে দেবে। ও একাই তোদের হারাবে।

অতো সোজা হবে না। আমিই ওকে মেরে ছাতু করবো।

হাসাস নে। বিল কী সুন্দর বল করে জানিস?

যত ভালো বল করুক, আমার কাছে পার পাবে না। আমি সেঞ্চুরি করে তোমায় দেখিয়ে দেবো।

ঠিক আছে, সেঞ্চুরি করতে পারলে তোকে একটা নতুন ব্যাট কিনে দেবো।

ঠিক তো?

হ্যাঁ।

বিল ওরিলির দলের বিরুদ্ধে ছোট্ট ডন দুরন্ত খেলা খেলে তিনশর ওপর রান করলো।

মাঠ থেকে ফিরেই মার কাছে হাত পেতে দাঁড়ালো ডন, দাও, নতুন ব্যাট কিনে দাও।

উইলিয়াম সাইকস কোম্পানি থেকে ডনের জন্যে নতুন ব্যাট কেনা হলো। পরে এই কোম্পানির সব ব্যাটে ডনের অটোগ্রাফ থাকতো।

ডন তখন ঐ অঞ্চলের বিস্ময় বালক। তার নাম ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই বছর সে করলো মোট ১৩১৮ রান। ইনিংস প্রতি যার গড় হিসেব একশর ওপর। নিউ সাউথ ওয়েলসের কর্তারা ততোদিনে নড়েচড়ে বসেছেন। না, ছেলেটার দিকে আর চোখ বুঁজে থাকা যায় না। এবার তাকে খেলাতে হবে। ১৯২৭-২৮ সালে সে নিউ সাউথ ওয়েলসের পক্ষে খেলার জন্যে ডাক পেল। খেলা দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। সেই ম্যাচে ডন করলো ১১৮ রান।

সেই শুরু। তারপর থেকে ডনকে আর কোনোদিন পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। দুর্দান্ত পারফরমেন্সের জোরে পরের বছরই সে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে টেস্ট খেলার জন্যে মনোনীত হলো। প্রথম টেস্টে ভালো খেলতে পারলো না। তাই দ্বিতীয় টেস্টে তাকে করা হলো দলের দ্বাদশ ব্যক্তি। তৃতীয় টেস্টে দলে ফিরেই সেঞ্চুরি।

পরবর্তী ২০ বছর ক্রিকেট দুনিয়ায় রাজত্ব করে গেলেন যিনি তিনি আর কেউ নন, সেই ছোট্ট ডন। পুরো নাম ডন ব্রাডম্যান। ক্রিকেটে কিংবদন্তী তিনি। ক্রিকেটের আদর্শ। ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। সম্প্রতি তিনি ক্রিকেটের মায়া কাটিয়ে পরলোকে চলে গেছেন। যিনি ছিলেন ক্রিকেটের শেষ কথা তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই।

এক নজরে স্যার ডন ব্রাডম্যান

জন্ম : ২৭ আগস্ট ১৯০৮ সালে নিউ সাউথ ওয়েলসের কোনটামুন্দ্রায়। ছোট-বেলাটা কাটে সিডনির কাছে বাউরালে। সেখানেই ক্রিকেট খেলার হাতেখড়ি।

টেস্ট খেলা : ১৯২৮-২৯ সালে ব্রিসবেনে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে খেলার সুযোগ পান। ব্যর্থ হওয়ায় দ্বিতীয় টেস্টে হন দ্বাদশ ব্যক্তি। কিন্তু সিডনির তৃতীয় টেস্টে দলে ফিরে দু'ইনিংসে করেন ৭৯ আর ১১২ রান। এরপর আর তাঁকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। টানা ২০ বছর পর্যন্ত তিনি ছিলেন অস্ট্রেলিয়া দলের প্রধান ভরসা।

রেকর্ড গড়া শুরু : ১৯২৯-৩০ সালে সিডনিতে কুইন্সল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪৫২ রান করেন। তাঁর এই ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের নজির ৩০ বছর পরে পাকিস্তানের মহম্মদ হানিফ ভাঙেন প্রথম শ্রেণীর খেলায় ৪৯৯

রান করে।

১৯৩০ সালে ইংলন্ড সফরে গিয়ে ব্রাডম্যান পাঁচটি টেস্টে মোট ৯৭৪ রান করেন। এর মধ্যে তিনটি ডবল সেঞ্চুরি আছে। এ রেকর্ড আজও কেউ ভাঙতে পারেননি। তবে তিনি সেবার টেস্ট ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ৩৩৪ রানের যে রেকর্ড গড়েছিলেন তা ভেঙে দিয়েছিলেন ইংলন্ডের লেন হাটন। হাটনের রেকর্ডও অবশ্য ভেঙে গেছে। হেডিংলেতে এই ৩৩৪ রান করতে গিয়ে তিনি অন্য রেকর্ডও গড়েছেন। প্রথমে লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি, তারপর ২১৪ মিনিটে দ্রুততম ডবল সেঞ্চুরি, তারপর দিনের শেষে ৩০৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। একদিনে ৩০৯ রান করার রেকর্ড আজও অটুট।

৫২টি টেস্ট খেলে তিনি করেছেন ৬৯৯৬ রান। গড়ে ইনিংস প্রতি ৯৯.৯৪ রান। মোট ২৯টি সেঞ্চুরি করেছিলেন। তার মধ্যে ১২বার ডবল সেঞ্চুরি। এর মধ্যে আবার দু'বার তিনশর ওপর রান করেন। শুধু ইংলন্ডের বিরুদ্ধেই তিনি করেছিলেন ৫০০০-এর ওপর রান।

শেষ টেস্ট : ১৯৪৮ সালে ওভালে তিনি শেষ টেস্ট খেলেন। জীবনের শেষ ইনিংসে তিনি রান করতে পারেননি। এরিক হোলিসের দ্বিতীয় বলে আউট হয়ে যান। গোটা মাঠ উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে তাঁকে বিদায় জানান।

নাইটহুড : ১৯৪৯ সালে তিনি হন স্যার ডন ব্রাডম্যান।

প্রকাশের পর গোপীচাঁদ

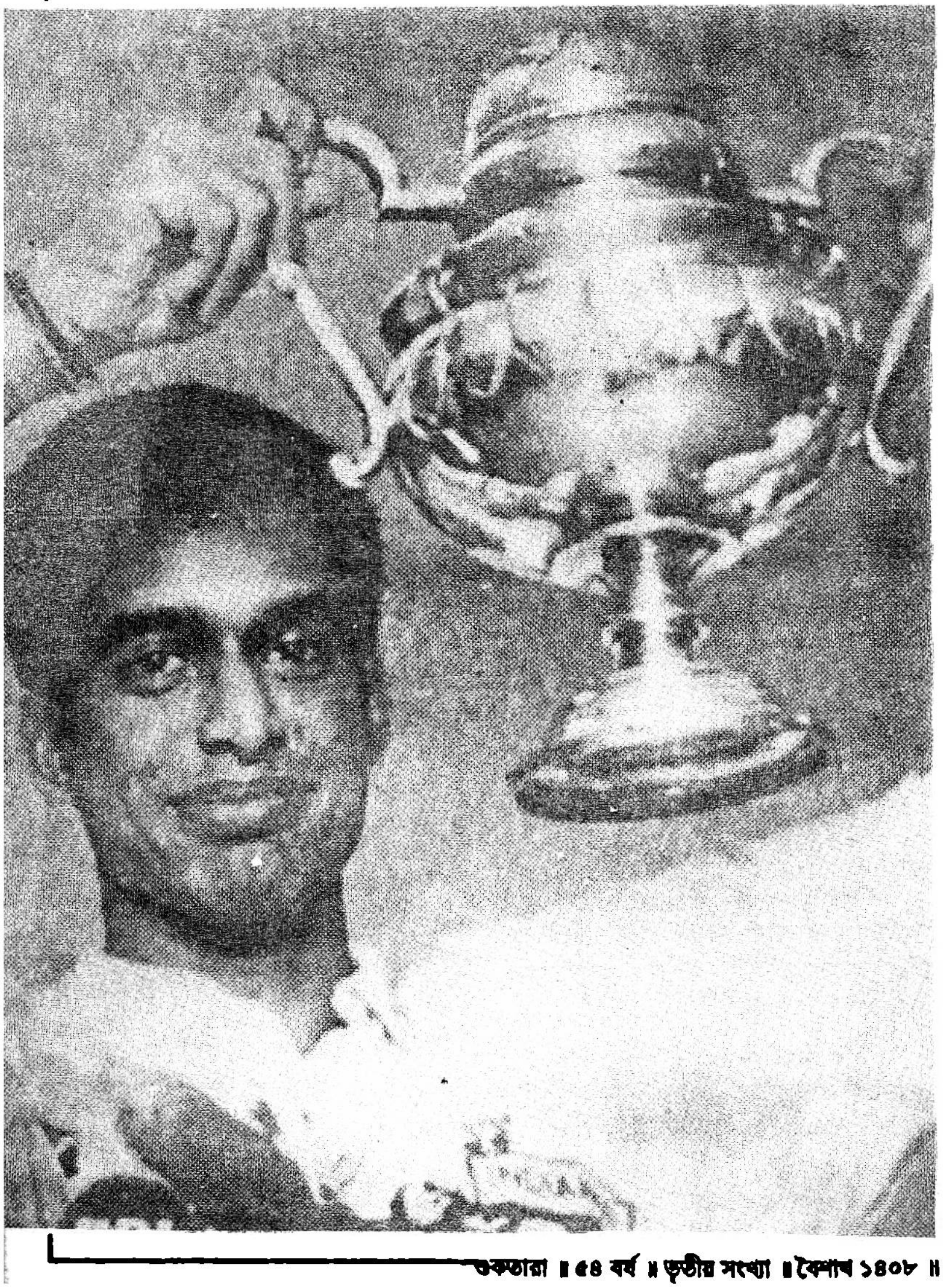

আজ থেকে একুশ বছর আগে প্রকাশ পাড়ুকোন অল ইংলন্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। দীর্ঘ দিন পর এবার সেই কৃতিত্ব অর্জন করলেন তাঁরই হাতে গড়া হায়দরাবাদের ২৭ বছরের পুল্লেলা গোপীচাঁদ। অল ইংলন্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালে তিনি হারিয়ে দিয়েছেন চীনের চেন হংকে ১৫-১২ ও ১৫-৬ গেমে।

উইম্বলডনকে যেমন বিশ্বের সেরা টেনিস প্রতিযোগিতা বলা হয়, উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নকে বিশ্ববিজয়ীর সম্মান দেওয়া হয়—ব্যাডমিন্টনে অল ইংলন্ড প্রতিযোগিতারও গুরুত্ব সেই একই। অল ইংলন্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন হচ্ছেন অঘোষিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ব্যাডমিন্টন বিশ্বে প্রকাশ পাড়ুকোন ভারতকে যে সম্মানের আসনে বসিয়েছিলেন, গোপীচাঁদ বার্মিংহামে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেই স্থানটি আরও দৃঢ় করলেন।

চ্যাম্পিয়ন হবার পর গোপীচাঁদ বলেছেন, এতদিনে আমার স্বপ্ন সফল হলো। ছোটবেলা থেকে এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমি বড় হয়েছি। আমি ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়নকে হারিয়েছি, বিশ্ববিজয়ীকে পরাজিত করেছি একে একে, তারপর তো লাভ করলাম এই অমূল্য সম্মান। এই জন্যে আমি আমার গুরু প্রকাশ পাড়ুকোনের কাছে সব থেকে বেশি কৃতজ্ঞ। আমি জানি, আমার এই সাফল্যে তাঁর চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবেন না।

বাঙ্গালোরে গোপীচাঁদের চ্যাম্পিয়ন হবার খবর পেয়ে প্রকাশ পাড়ুকোন

বলেছেন, ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে আজকের দিনটি (১১ মার্চ ২০০১) সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। গোপী প্রমাণ করে দিয়েছে, ভারতীয়রা বিশ্ববিজয়ীদেরও হারাতে পারে। গোপীকে এখন আরও ভালো খেলতে হবে। খেলার উন্নতি ঘটাতে হবে। আমি চাই, ও বিশ্বের এক নম্বর ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হোক। গোপী যেভাবে এগোচ্ছে, তার অগ্রগতি যদি সেইভাবে চলতে থাকে তাহলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে গোপীচাঁদের আর খুব একটা বেশি সময় লাগবে না। গোপী এখন বিশ্বের ৫ নম্বর খেলোয়াড়। আমি আশা করবো, গোপীর র‍্যাঙ্কিং এখন থেকে আরও ভালো হবে।

গোপীচাঁদ প্রকাশের ব্যাডমিন্টন আকাদেমির ছাত্র। তাই প্রকাশ আরও বেশি খুশি। কারণ তাঁরই ছাত্র আজ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। বছর দু'য়েক আগে প্রকাশের সঙ্গে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থার কর্তাদের লড়াই প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। তখন প্রকাশ বলেছিলেন, আমি যে আজও বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় তৈরি করতে পারি তা আমি প্রমাণ করে দেবো। গোপীচাঁদের এবারের এই সাফল্য প্রমাণ করে দিলো প্রকাশ সঠিক কথাই বলেছিলেন। প্রকাশের দৃঢ় বিশ্বাস গোপীচাঁদ আরও অনেক দূর এগোবে। ভারতকে আরও সম্মান এনে দেবে।

এক নজরে

রিভাল্ডো বাদ

জোর ধাক্কা খেলেন ব্রাজিলের রিভাল্ডো। রিভাল্ডো ইউরোপের সেরা খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছেন আগেই। এবার পেলেন সম্মানসূচক ফ্রান্স ফুটবল প্রাইজ। কিন্তু ঐ পুরস্কার পাবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি বাদ পড়লেন বার্সিলোনা দল থেকে। তার কারণ আর কিছুই নয় বার্সিলোনার কোচ লুইস ভ্যানগালের সঙ্গে তাঁর ঠাণ্ডা সম্পর্ক। স্পেনের প্রথম বিভাগীয় ফুটবল লীগে বার্সিলোনার সঙ্গে রাও ভ্যালেনসিয়ানোর খেলা ছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মতবিরোধের জন্যে কোচ রিভাল্ডোকে দল থেকে বাদ দিলেন। লুইস ভ্যানগাল গত আড়াই বছর বার্সিলোনার কোচ। প্রথম থেকেই তার সঙ্গে রিভাল্ডোর সম্পর্ক ভালো নয়। কোচ বলেছেন, রিভাল্ডো আমাকে অত্যন্ত বিরক্ত করেছে। আমি জানি, সে খুবই বড় খেলোয়াড়। তার অনুপস্থিতিতে দলের ক্ষতিই হবে। তবে এই সব মুহূর্তে, এমন কেউ কেউ উঠে আসেন যিনি বা যাঁরা স্টার খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতি অনুভব করতে দেন না। না হলেও ক্ষতি নেই। মনে রাখতে হবে, কোনো খেলোয়াড়ই ক্লাব বা তার আদর্শ থেকে বড় হতে পারেন না।

উক্তি

আমি এতগুলো সেঞ্চুরি করেছি, কিন্তু কলকাতার ইডেন উদ্যানে একটাও করতে পারিনি। আমার সেঞ্চুরির রেকর্ডে এবার আমি কলকাতার নামটা জুড়ে দিতে চাই। জানি না পারবো কিনা। তবে চেষ্টা করবোই।

শচীন তেন্ডুলকার

(ইডেনের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ শুরু হবার আগে)

চিমাকে যদি ঠিকভাবে তৈরি করে নিতে পারি তাহলে ঐ হবে আমার ট্রাম্প কার্ড। চিমা এখন অনেক বদলে গেছে। আগের মতো উগ্রভাব আর নেই। কিন্তু খেলা.....সে তো দেখতেই পাবেন।

সুব্রত ভট্টাচার্য

(মোহনবাগানের হয়ে চিমা প্র্যাকটিশ শুরু করার দিন)

একটা টেস্টে খেলতে পারিনি বলে চারদিকে 'গেল গেল' রব পড়ে গেছে। আগের খেলাগুলোয় সাফল্যের কথা কি সকলে ভুলে গেছেন? তাহলে না হয় একবার আমার খেলার হিসেবের ওপর চোখ বুলিয়ে নিন।

সৌরভ গাঙ্গুলি

(ইডেনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ শুরু হবার দিন দুয়েক আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে)

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটি টেস্টে দু'ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেছিলাম। দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটি করার পরই ব্রাডম্যান এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তটি আমি চিরকাল খুশি হয়ে মনে রাখার চেষ্টা করবো।

বিজয় হাজারে

(ব্রাডম্যানের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে)

প্রথম টেস্টের পর ভারতীয় দলের অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলির সমালোচনা যেভাবে করা হয়েছে তা কিন্তু অন্যায়। যে বোলিং চেঞ্জের জন্যে অত কথা সেই পরিবর্তনের পর শচীন যদি একটি-দুটি উইকেট পেয়ে যেতেন তাহলে কিন্তু যাঁরা সমালোচনা করছেন তাঁরাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন।

স্টিভ ওয়া

(দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে)

ক্রিকেট নিয়ে আমাকে কেউ কোনো কথাই বলবেন না। আমি শুনতে চাই না। জানি পারবো না তবু ক্রিকেট শব্দটাই ভুলে যেতে চাই।

কপিলদেব

(একজন সাংবাদিক ভারত-অস্ট্রেলিয়ার খেলার প্রসঙ্গ তুলে প্রশ্ন করার পর)

আমার কাঁধ নিয়ে আমায় সতর্ক হতেই হবে। অনেক ভেবেচিন্তেই আমি ঐ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মহেশ ভূপতি

(সিঙ্গলসে না খেলার সিদ্ধান্তর কথা ঘোষণা করার সময়)

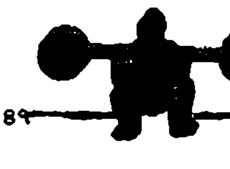

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম

তুষার শীল

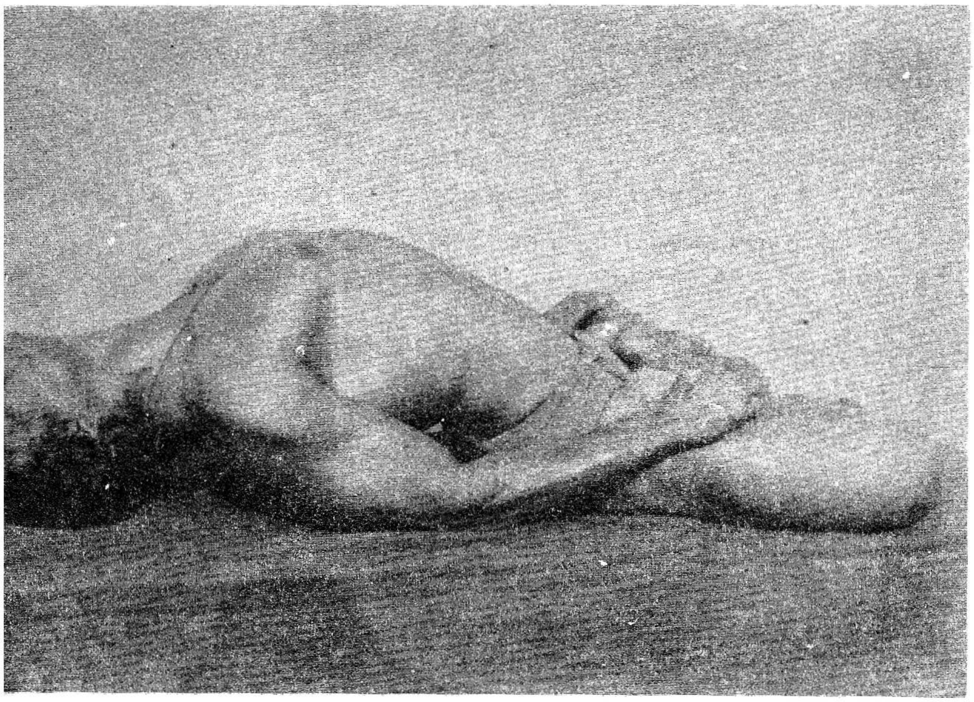

নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ ব্যায়ামের আসর শুরু করছি। কামনা করি সারা বছর তোমরা সুস্থ থাক, সবল থাক। নতুনকে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে পুরনোকে একদম ঝেড়ে ফেলে দিও না। পুরনোর যা কিছু ভালো, যেমন শরীরচর্চার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা গড়ে তোলা, তা কিন্তু আগের মতোই ধরে রাখবে। শরীরচর্চা যেন একদিনও বাদ না পড়ে। নতুন বছরে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার। মনের কুঁড়েমি, শারীরিক অলসতা বা সময়াভাবের অজুহাত কোনো কিছুই যেন আমাদের গ্রাস না করে। নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে দূর হয় যেন আমাদের শরীর ও মনের সব ব্যাধি।

এখন আজকের আসন মৎস্যাসন। এটিকে মৎস্যমুদ্রা নামেও অভিহিত করা রয়েছে যোগশাস্ত্রে। যেহেতু এই আসনটিতে আমাদের থাইরয়েড, প্যারা-থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ ভালো হয়, তাই এটিকে মুদ্রার পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। পদ্মাসনে অর্থাৎ বাঁ উরুর ওপর ডান পা এবং ডান উরুর ওপর বাঁ পা হাঁটু থেকে ভাঁজ করে তুলে দাও। এবার হাত ও কনুইয়ের ভরে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে কনুই বা হাতের তালু মেঝেতে চাপ দিয়ে বুকটাকে উঁচু করে দাও অর্থাৎ পিঠটা তুলে দাও এবং মাথার ব্রহ্মতালু মাটিতে পেতে দাও, যেমনটি দিয়েছে ছবির পুরুষটি। এই অবস্থানে থেকে আট-দশ বার গভীর ও লম্বা লম্বা দম নেওয়া-ছাড়া কর। পারলে তলপেটটা একটু ঢুকিয়ে রেখ। পরে মাথা ও পিঠ নামিয়ে ধীরে ধীরে দু'পা খুলে নিয়ে অর্থাৎ ছড়িয়ে দিয়ে শবাসনে বিশ্রাম নাও দশ-পনেরো সেকেন্ড। আসন অবস্থাতেও দশ-পনেরো বার দম নেওয়া-ছাড়া করবে। আসন ও শবাসন মিলে এক ক্ষেপ হলো। এভাবে দু'তিন ক্ষেপ অভ্যেস করো। বিশেষ করে নতুনদের জন্য লিখছি, যারা পদ্মাসন করে মৎস্যাসন করতে পারবে না, তারা পা-দুটি ছড়িয়ে রেখে ছবির অবস্থানে অর্থাৎ মাথার ব্রহ্মতালু মাটিতে পেতে দিয়ে এবং পিঠটা তুলে দিয়ে অভ্যাস করবে। বুক উঁচু করতে না পারলে পিঠের তলায় ঘাড় পর্যন্ত বালিশ দিয়ে মাথাটা বালিশের বাইরে ঝুলিয়ে দেবে, পারলে ব্রহ্মতালু মাটিতে পেতে দিও।

টনসিলের গণ্ডগোলের জন্য যারা প্রায়ই সর্দি-কাশিতে ভোগে, তারা নিশ্চয়ই এই আসনটিকে অভ্যাস করবে। টনসিলের রোগও এতে ভালো হয়। যাদের বুকের খাঁচার গঠনে দোষ রয়েছে, বিশেষ করে পায়রার বুকের মতো যাদের বুকের গঠন অর্থাৎ পিজিয়েন চেস্ট তারা এই আসন অভ্যাসে তা থেকে মুক্তি পাবে। হাঁপানি রোগীদের বায়ুধারকত্ব অর্থাৎ ফুসফুসের ভাইটাল ক্যাপাসিটি বেড়ে যাবে। শ্বাসনালী যাদের খুবই সরু, নিয়মিত অভ্যাসে সেই গঠনগত দোষ দূর হবে। শিরদাঁড়ার নমনীয়তাও বাড়ায়। যারা সামনে কোলকুঁজো এই আসন তাদের সেই কুঁজো ভাব দূর করবে। বুকের পেশীর গঠন হবে সুন্দর। লম্বালম্বি গলায় টান পড়ার ফলে গলার গঠন সুন্দর হবে ও ডবল চিন কমবে। থাইরয়েডের গণ্ডগোলের জন্য যারা মোটা, তারা আসন তালিকায় বিপরীতকরণী ও মৎস্যাসন এই দুটি মুদ্রা অবশ্যই রাখবে। কারণ থাইরয়েডের গণ্ডগোল দূর করতে প্রাথমিক অবস্থায় এই দুটি আসনের জুড়ি মেলা ভার।

আসনটি করতে অনেকের মাথা ঘোরে। তারা মাথা বেশি ওলটাবে না এবং চোখ বন্ধ রেখে অবশ্যই করবে। খুব ভালো হয় মাথার ব্রহ্মতালুর নিচে একটি তোয়ালে বা নরম কিছু পেতে নিলে।

উঠছে যারা

বীরু বসু

কোচ হিসেবে তেমন কোনো স্বীকৃতি তাঁর নেই। তবুও তিনি অনেক বড়। তাঁরই নিরলস প্রচেষ্টায় নদীয়া জেলার গয়েশপুর ক্রিকেট কোচিং সেন্টার থেকে উঠে এসেছে একঝাঁক উজ্জ্বল ক্রিকেটার। এলাকায় খেলাধুলোর প্রসার ঘটাতেই দীর্ঘ চোদ্দ বছর ধরে ক্রিকেটার তৈরি করে চলেছেন শিশির সুর।

তাঁর ছাত্রদের অধিকাংশই এখন সি. এ. বি. লিগে নিয়মিত খেলছেন। মিঠুন মজুমদার (পোর্টট্রাস্ট), অভিজিৎ চৌধুরী (মহমেডান স্পোর্টিং), বিপ্লব মজুমদার, শান্তনু পাল, নির্মল কর (ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ), শুভ্র শঙ্কর কর্মকার (এয়ারফোর্স) এখন নদীয়া জেলার গর্ব। তবে এই মুহূর্তে কোচিং সেন্টারটির নজর যার দিকে সে হলো সতেরো বছরের কিশোর শৌভিক বণিক। বাংলার ক্রিকেটে আগামী দিনে সে যে সাড়া জাগাবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শৌভিক ডানহাতি ব্যাটসম্যান এবং উইকেট কিপার। এগারো বছর বয়স থেকেই কোচিং সেন্টারে তার যাতায়াত। বাড়িতে খেলাধুলোর পরিবেশ আছে। ৬/১৯০৩, গয়েশপুর, কল্যাণী, নদীয়া—তার আসল ঠিকানা। কাকা অদ্বৈত বণিক রেলওয়ে এফ. সি.-র নিয়মিত গোলকিপার। কাকার ফুটবল তাকে টলাতে পারেনি। কোচ শিশির সুরের প্রচেষ্টাতেই শৌভিক ভর্তি হয়ে যায় কোচিং সেন্টারে। তারপর থেকে শুধু প্র্যাকটিশ আর প্র্যাকটিশ।

নিয়মিত মাঠে আসার ব্যাপারে শৌভিক বরাবরই সিরিয়াস। সে কারণেই সাফল্য তার পেছন পেছন ছুটছে। বছর ছয় হলো প্রতিযোগিতায় সে অংশ নিচ্ছে। প্রথমে

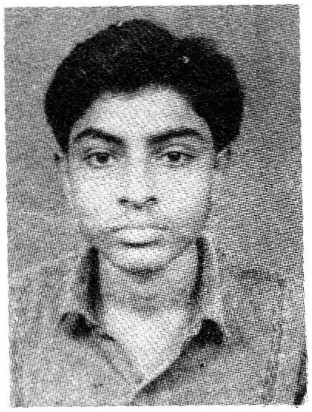

শৌভিক বণিক

জেলার ক্রিকেট, তারপরেই সি. এ. বি. পরিচালিত বিভিন্ন টুর্নামেন্টে সাফল্য পায় শৌভিক। গত বছরে ভিনু মানকড় ট্রফিতে বাংলা স্কুল দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে। এরপরেই নদীয়া জেলা লীগে কল্যাণী টাউন ক্লাবের বিপক্ষে ১০৭ রান করে। দাত্তু ফাদকার ট্রফিতে শৌভিক গয়েশপুর নেতাজী বিদ্যামন্দিরের হয়ে বেশ কটি ম্যাচে দারুণ খেলেছে। রানাঘাট পাল চৌধুরী স্কুলের বিপক্ষে তার সর্বোচ্চ রান ছিল ৭৮। রানাঘাট ভারতী হাই স্কুলের বিপক্ষে ছিল ৪৮ রান। চাকদহ রামলাল অ্যাকাডেমির বিপক্ষে তার রান ছিল ৩৮। দু'বছর আগে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ব্রিজেশ প্যাটেল ট্রফিতে শৌভিক সেরা ক্রিকেটারের সম্মান পেয়েছে। ৭টি ক্যাচ ধরায় নির্বাচকরা তাকে বেস্ট উইকেট কিপার হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন। এছাড়া অনূর্ধ্ব ১৯ সি. কে. নাইডু ট্রফিতেও শৌভিক বাংলা স্কুল দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে। ধৈর্য, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ধরে রাখতে পারলে ক্রিকেট খেলাটা যে কত সহজ ও সরল তা এতদিনে বুঝে গেছে গয়েশপুর নেতাজী বিদ্যামন্দিরের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র শৌভিক বণিক।

শৌভিকের বাবা সত্যনারায়ণ বণিক বি. এল. ও.-তে চাকরি করেন। মা বীথিকা বণিক। উভয়েই ক্রিকেটকে ভালবাসেন। আর্থিক অনটন না থাকায় একমাত্র ছেলের খেলার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাচ্ছেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস গয়েশপুর ক্রিকেট কোচিং সেন্টার থেকেই শৌভিক একদিন বাংলার ক্রিকেটে রাজত্ব চালাবে। ক্রিকেটে শৌভিকের প্রিয় খেলোয়াড় শচীন তেন্ডুলকর। শচীনের হাঁটাচলা, কথাবার্তা, ব্যাটিং-এর ধরনধারণ সবই তার পছন্দ। শৌভিক মনে করে বর্তমানে বাংলার ক্রিকেটে ভাল উইকেট কিপারের দারুণ অভাব। সে কারণেই ব্যাটিং-এর পাশাপাশি বেছে নিয়েছে কিপিংটাকে। ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্যাচ ধরার ব্যাপারে শৌভিক এখন রীতিমতো পরিণত। শৌভিক তার কোচ শিশির সুরকে কথা দিয়েছে, যদি ক্রিকেট খেলে কোনোদিন পয়সা রোজগার করতে পারে সেদিন কোচিং সেন্টারকে একটি নেট এবং একটি কংক্রিটের পিচ করে দেবে। সে মনে করে গ্রামবাংলার ক্রিকেটের উন্নতিতে কারোর নজর থাকে না। থাকলে চোদ্দ বছরে অন্ততপক্ষে একটি নেট গয়েশপুর ক্রিকেট কোচিং সেন্টারে দেখা যেত। দেখতে না পাওয়াটিও এখন ক্রিকেট দুনিয়ার কাছে বড় খবর।

কেরিয়ার গাইড

ডি. এ. চন্দ্রণ

বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন পাঠক্রম

শুধু মোক্ষলাভের-জন্যই বারাণসীর খোঁজ করা নয়, বিভিন্ন কোর্সে পড়াশোনার জন্যও আজকাল বারাণসীর খোঁজখবর রাখা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙালীর প্রিয় বারাণসী সেক্ষেত্রে অনেকটাই আকর্ষণীয়। প্রতি বছর মে মাস নাগাদ বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির জন্য জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে ভর্তির পরীক্ষা নেওয়া হয়। এবার এখানকার পঠনপাঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক।

আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স

আন্ডার গ্র্যাজুয়েট বিভিন্ন কোর্সের মধ্যে রয়েছেঃ (১) তিন বছরের আর্টস বিষয়ে অনার্স কোর্স এবং বিভিন্ন সোস্যাল সায়েন্সে অনার্স কোর্স। এক্ষেত্রে প্রার্থীকে কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে ১০ + ২ পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। (২) তিন বছরের বি. এসসি অনার্স কোর্স। এই কোর্সে ভর্তি হতে হলেও প্রার্থীকে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে ১০ + ২ পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে পাশ করতে হবে। (৩) তিন বছরের বি. কম অনার্স কোর্স। এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে ১০ + ২ পরীক্ষায় কমার্স/ইকনোমিক্স/ম্যাথমেটিক্স/কমপিউটার সায়েন্স যে কোনো একটি বিষয়সহ কমপক্ষে এগ্রিগেটে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। (৪) তিন বছরের শাস্ত্রী (অনার্স) কোর্স। এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে ১০ + ২ পরীক্ষায় সংস্কৃত বিষয়সহ কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বরসহ পাশ করতে হবে। (৫) চার বছরের বি. এসসি (এগ্রিকালচার) কোর্স। এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে এগ্রিকালচার অথবা সায়েন্স স্ট্রিমে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স/বায়োলজি বিষয়সহ এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে ১০ + ২ পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। (৬) চার বছরের বি. এফ. এ. কোর্স। এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে ১০ + ২ পরীক্ষায় যে কোনো স্ট্রিমে কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। (৭) তিন বছরের বি. মিউজ কোর্স। এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে ১০ + ২ পরীক্ষায় কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে মিউজিক প্র্যাকটিক্যালে পাশ করতে হবে। স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর প্রার্থীরাও এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারে। (৮) তিন বছরের বি. পি. ই. কোর্স। এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে ১০ + ২ পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে।

এক বছরের ব্যাচেলর অব জার্নালিজম, ব্যাচেলর অব লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, এক বছরের বি. এড/বি. এড (স্পেশাল) কোর্স। এই সব কোর্সের যে কোনো একটিতে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে ১০ + ২ + ৩ প্যাটার্নে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বরসহ স্নাতক হতে হবে। অথবা স্নাতকোত্তর কোর্সে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। বি. এসসি (এজি) অথবা এম. এসসি (এজি) প্রার্থীরা বি. এড কোর্স করতে পারবে না। (২) তিন বছরের এল. এল. বি. কোর্স। এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে ১০ + ২ + ৩ প্যাটার্নে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নম্বর পেয়ে (এগ্রিগেটে) স্নাতক হতে হবে।

এখন অনেকের মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, এসব কোর্স কেবলমাত্র বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতেই পড়ানো হয় নাকি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অন্যত্রও পড়ানো হয়? বলে রাখা দরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব কোর্স ফ্যাকাল্টি অব আর্টস, সোস্যাল সায়েন্স, মহিলা মহাবিদ্যালয় বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয়ে থাকে। এছাড়া অনুমোদিত কলেজ যেমন আর্য মহিলা ডিগ্রি কলেজ, বসন্তকন্যা মহাবিদ্যালয়, বসন্ত কলেজ ফর উওমেন, ডি এ ভি ডিগ্রি কলেজেও পড়ানো হয়। বি. কম কোর্স পড়ানো হয় বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অব কমার্সে। এছাড়া ডি এ ভি ডিগ্রি কলেজ, বসন্ত কলেজ ফর উওমেন-এ পড়ানো হয়। বি. এড কোর্স পড়ানো হয় বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশন, আর্য মহিলা ডিগ্রি কলেজ, বসন্ত কলেজ ফর উওমেন-এ।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স

এবার আসা যাক বিভিন্ন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের আলোচনায়। প্রথমেই জানিয়ে রাখি, (১) এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, পালি, সংস্কৃত, তেলেগু, উর্দু, নেপালি বিষয়ে এম. এ. পড়ানো হয়। এছাড়া প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন, ভূগোল, রাশিবিজ্ঞান (স্ট্যাটিসটিক্স), ম্যাথমেটিক্স (গণিত), হোম সায়েন্স বিষয়ে এম. এ. পড়ানো হয়। এইসব বিষয়ে এম. এ. কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে ১০ + ২ + ৩ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে ৪৮ শতাংশ নম্বরসহ স্নাতক হতে হবে। (২) লিঙ্গুইস্টিক্স বা ভাষাতত্ত্বে এম. এ. করতে হলে প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১০ + ২ + ৩ পর্যায়ে ৪৮ শতাংশ নম্বর

পেয়ে স্নাতক হতে হবে অথবা ১০ + ২ + ৩ পর্যায়ে অনার্সসহ পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে কমপক্ষে ৪৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। (৩) জার্মান, ফ্রেঞ্চ, চাইনিজ, এরাবিক, পার্সিয়ান, রাশিয়ান, মারাঠী যে কোনো বিষয়ে এম. এ. করতে হলে প্রার্থীকে ১০ + ২ + ৩ পর্যায়ে ৪৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্নাতক হতে হবে অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা থাকতে হবে। (৪) ইন্ডিয়ান ফিলোজফি অ্যান্ড রিলিজিয়ান বিষয়েও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদাভাবে এম. এ. পড়ানো হয়। এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১০ + ২ + ৩ পর্যায়ে কমপক্ষে ৪৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে কিংবা বিদেশি স্নাতক ডিগ্রি সেই সঙ্গে এই বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৮ শতাংশ নম্বর পেলে ভর্তির আবেদন করা যাবে। (৫) বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনোমিক্স/হিস্টরি/পলিটিক্যাল সায়েন্স/সোসিওলজি/সাইকোলজি বিষয়েও এম. এ. পড়ানো হয়। এই সব বিষয়ে এম. এ. পড়তে হলে প্রার্থীকে ১০ + ২ + ৩ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে ৪৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্নাতক হতে হবে। (৬) সায়েন্স বিষয়ের মধ্যে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বটানি, জুলজি, জিওলজি, জিওগ্রাফি, ম্যাথমেটিক্স, কমপিউটার সায়েন্স, হোম সায়েন্স, স্ট্যাটিসটিক্স, সাইকোলজি প্রভৃতি বিষয়ে এম. এসসি কোর্স পড়ানো হয়। এই সব বিষয়ে এম. এসসি কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে ১০ + ২ + ৩ প্যাটার্নে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান বিষয়ে কমপক্ষে ৪৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। বটানি/জুলজি বিষয়ে এম. এসসি কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকস্তরে কেমিস্ট্রি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। (৭) বায়োকেমিস্ট্রিতে এম. এসসি কোর্স করতে হলে কেমিস্ট্রি/বায়োকেমিস্ট্রি বিষয়সহ ১০ +২ + ৩ পর্যায়ে কমপক্ষে ৪৮ শতাংশ নম্বরসহ স্নাতক হতে হবে। তবে কেমিস্ট্রি বিষয়ের সঙ্গে আরও যে কোনো দুটি বিষয়ও পড়তে হবে যেমন, বায়োকেমিস্ট্রি, বটানি, জুলজি, ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স, ফিজিওলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাইক্রোবায়োলজি ইত্যাদি। এসব বিষয়ে কমপক্ষে দু'বছর পড়ে থাকা দরকার। (৭) তিন বছরের এম. এসসি (টেক) জিওফিজিক্স কোর্স। এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে বি. এসসি অনার্স (১০ + ২ + ৩ প্যাটার্নে) এবং কম্বিনেশন বিষয় হিসাবে ফিজিক্স এবং ম্যাথমেটিক্স নিয়ে পাশ করতে হবে। এবং বিজ্ঞান বিষয়ে কমপক্ষে ৪৮ শতাংশ নম্বরসহ পাশ করতে হবে। (৮) যেসব প্রার্থী বি. কম. অনার্সে ১০ + ২ + ৩ পর্যায়ে কমপক্ষে ৪৮ শতাংশ নম্বরসহ পাশ করেছে তারা এম. কম. কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

আমরা জানি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, ধর্ম, সংস্কৃত বিষয়ে বিশেষভাবে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা আছে। সেই ধারার সঙ্গে সংগতি রেখে এখানে বেদ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়বৈশেশিকা, প্রচীন ন্যায় প্রমুখ বিষয়ে অনার্স কোর্স পড়ানো হয়। এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ ১০ + ২ + ৩ পর্যায়ে শাস্ত্রী পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। (২) এখানে সাংখ্যযোগ, পুরাণেতিহাস এবং সাহিত্য, ধর্মাগম বিষয়ে আচার্য কোর্স পড়ানো হয়। এক্ষেত্রেও প্রার্থীকে শাস্ত্রী পরীক্ষায় ১০ + ২ + ৩ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে ৪৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। (৩) বৌদ্ধ দর্শন/জৈন দর্শনে আচার্য কোর্স পঠনপাঠনেরও ব্যবস্থা আছে এখানে। বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে সংস্কৃত/পালি বিষয়ে ১০ + ২ + ৩ পর্যায়ে কমপক্ষে ৪৮ শতাংশ নম্বরসহ স্নাতক হতে হবে। জৈন দর্শনের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে সংস্কৃত/প্রাকৃত বিষয়ে ১০ + ২ + ৩ পর্যায়ের স্নাতক হতে হবে এবং কমপক্ষে ৪৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে।

(চলবে)

জানা-অজানা

মহসীন মল্লিক

পাখির হাসি

অস্ট্রেলিয়ায় এক ধরনের পাখি আছে যারা অবিকল মানুষের মতো হাসতে পারে। ভোরবেলা একটা পাখি চাপা হাসির মতো শব্দ করতে থাকে। আর সেই ডাক শুনে তার সঙ্গে যোগ দেয় আরও অনেক হাসতে-জানা পাখি। আসলে এরা এইরকম হাসি হাসে অন্য পশুপাখিদের ভয় দেখাবার জন্য। তাদের এই হাসি শুনে অন্য পাখিরা মনে করে মানুষ হাসছে। তখন তারা আর হাসতে-জানা পাখিদের কাছে এগোয় না। এই পাখিদের অনেক নাম। কেউ বলে লাফিং জ্যাক অ্যাস, কেউ বলে বুশম্যান ক্লক। এরা মাছরাঙা জাতীয় পাখি। তবে এদের খাদ্য মাছ নয়। এরা ব্যাঙ, ফড়িং, গিরগিটি, সাপ ইত্যাদি খায়। এদের দৈর্ঘ্য সতের ইঞ্চির মতো। ইউক্যালিপটাস গাছে বাসা বেঁধে বসবাস করে। এদের প্রচলিত নাম 'কুকাবুরা'। অস্ট্রেলিয়ার সিনেমা হলে ছবি দেখানোর আগে এদের হাসি শোনাবার রেওয়াজ ছিল।

গুরুদাস বাগুই স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার
প্রথম পুরস্কৃত গল্প

ফুল ঝরে যায়

সমীর কুমার ঘোষ

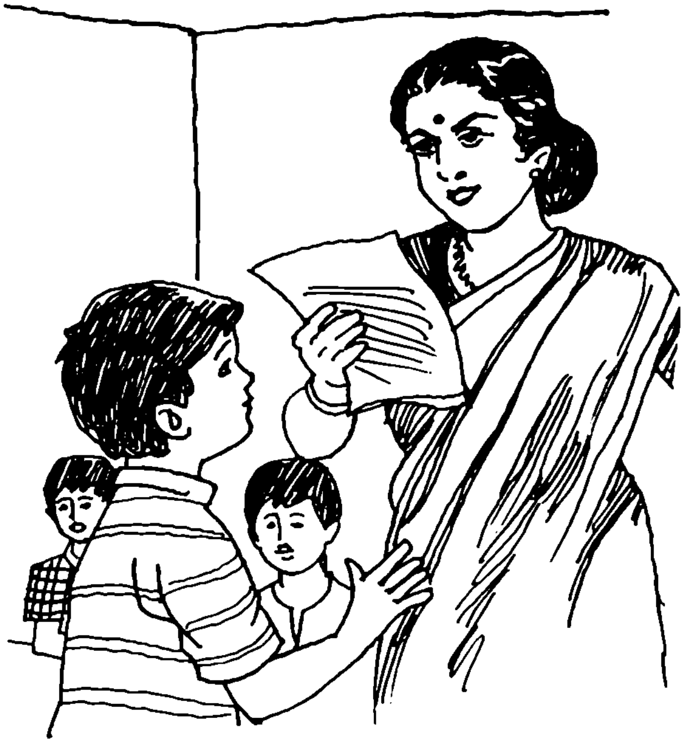

রোল নাম্বার ওয়ান।

ইয়েস ম্যাডাম।

টু।

কোনো সাড়া নেই।

ক্লাসটিচার জয়তীদি লক্ষ্য করলেন, ক্লাসের সেকেন্ড বয় পার্থজিৎ আজও অনুপস্থিত।

নাম ডাকা শেষ হলে একবার ভাবলেন, কি হলো ছেলেটার! দিন দশেক হয়ে গেল অথচ এখনও দেখা নেই। ও তো এরকমভাবে অ্যাবসেন্ট হয় না কখনও! খুব অল্প ক'দিন দেখছেন ছেলেটাকে। কিন্তু এর মধ্যেই কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে ওর ওপরে।

আসলে খুব প্রাণবন্ত ছেলে বলতে যা বোঝায় পার্থজিৎ ঠিক তাই। পড়াশুনোয় যেমন মেধাবী, ছবি আঁকা, আবৃত্তিতেও তেমনি পারদর্শী। গরীব ঘরের ছেলে কিন্তু মুখে হাসিটি লেগে থাকে সবসময়।

ক্লাসে দিদিমণিরা যখন যে টাস্ক দেন, করে দেখায় অনায়াসে। এভাবে আপনগুণে ও স্কুলের সহপাঠী ও দিদিমণিদের কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে অচিরে।

এই তো গত বছর বড়দিনের ছুটির পর যেদিন স্কুল খুলল, সেদিন জয়তীদি বাংলা পড়াতে এসে বলেছিলেন, এখন তো শীতকাল, তা তোমরা এই শীতকাল নিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে একটা ছোট্ট রচনা লিখে দেখাও তো দেখি।

নির্দেশ পেতেই যে যার মতো লিখতে শুরু করে দিয়েছিল। লেখা শেষ করে একে একে সকলে যখন খাতাগুলো জমা দিল, তখন তিনি সেগুলো দেখতে শুরু করলেন। হঠাৎ একটা খাতার উপর চোখ বোলাতে চমকে উঠলেন তিনি,—বাংলার বুক থেকে উৎসবের শেষ রেশটুকু যখন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়, ঠিক তখনই লাজুক পায়ে আবির্ভাব ঘটে শীত ঋতুর।

বাঃ কী সুন্দর শুরু করেছে ছেলেটা! হাতের লেখাটাও তেমনি। যেন মুক্তো বসানো। পুরো রচনাটা একটানা পড়ে ফেললেন তিনি। সত্যিই দারুণ লিখেছে ছেলেটা। এই স্কুলে তিনি তখন নতুন। মাসখানেক হলো জয়েন করেছেন। ক্লাস ফোরের একটা ছাত্র এত ভাল লিখতে পারে,. এ তিনি ভাবতেই পারেন না। খাতাটা উল্টে নামটা দেখলেন তিনি—পার্থজিৎ রায়। ছাত্রটি পড়াশুনোয় ভাল ঠিকই কিন্তু তা বলে এত সুন্দর করে লিখল কী করে?

নাম ধরে ছাত্রটিকে ডাকলেন তিনি। কাছে এলে বললেন, তোমাকে কী কেউ শিখিয়েছিল রচনাটা?

না দিদি।

তাহলে?

আমি নিজে নিজেই বানিয়ে লিখেছি।

বাঃ দারুণ লিখেছ তো। তোমাকে আমি দশে দশ নম্বরই দিলাম। খাতাটা ওকে ফেরৎ দিয়ে বাকি খাতাগুলো দেখে চলে গিয়েছিলেন তিনি।

দিন সাতেক পর আবার একদিন ক্লাসে এসে কয়েকটা বাক্য রচনা করতে দিয়েছিলেন তিনি। এদিনও একে একে সবাই খাতা জমা দিলে তিনি পার্থজিতের লেখা বাক্যগুলো পড়ে বিস্মিত হলেন। প্রতিটি বাক্যই কত সুন্দর হয়েছে। খাতার অন্যান্য পাতাগুলো দেখতে দেখতে একটা পাতায় চোখ পড়ল তাঁর। দেখলেন একটা ছড়া লেখা—

বাবা শুধুই পড়তে বলে
মা'র মতটাও তাই
কেমন করে বোঝাই তাঁদের
ঠিক কী আমি চাই!
চাই যে আমি শচীন হয়ে
মারতে চার আর ছয়,
পড়া নিয়েই থাকলে শুধু
কেমনে তা হয়!

ক্লাস ওয়ার্কের খাতায় ছড়া ? গর্জে ওঠার কথা জয়তীদির। কিন্তু তা না করে তিনি সেদিন আবারও কাছে ডাকলেন ওকে। বললেন, এই ছড়াটা তুমি লিখেছ?

অপরাধীর মতো মুখ করে উত্তর দিল পার্থজিৎ, হ্যাঁ দিদি।

ভালই তো লিখেছ। চেষ্টা করলে আরও ভাল লিখতে পারবে।

স্কুলের খাতায় ছড়া লেখা সত্ত্বেও দিদি যে ওকে বকলেন না, শাস্তি দিলেন না বরং গালটা টিপে একটু আদর করে দিলেন এতে বেজায় খুশি হলো ও। জয়তীদি ওর গালটা টিপে দিয়ে বলেছিলেন, লিখবে, তবে স্কুলের খাতায় নয়, কেমন?

ঘাড় কাৎ করে বলেছিল ও, আচ্ছা দিদি।

তারপরই এসে গেল সরস্বতী পুজো। বড়দি ক্লাসে ক্লাসে নোটিশ পাঠালেন, স্কুলে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে একটা ছবির প্রদর্শনী হবে। প্রদর্শনীতে যারা নিজের আঁকা ছবি দিতে চায়, তাদের ক্লাসটিচার-এর কাছে তিন কপি ছবি জমা দিতে হবে। যেটি ভাল হবে সেটি প্রদর্শনীতে দেওয়া হবে।

অনেকে ছবি জমা দিল। কিন্তু পার্থজিতের ছবি তিনটে হাতে পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন জয়তীদি। অসাধারণ নিসর্গের ছবি এঁকেছে ছেলেটি। কোনটি ছেড়ে কোনটি রাখবেন মনস্থির করতে না পেরে তিনটি ছবিই জমা নিয়ে নিলেন তিনি। প্রদর্শনীতে রাখা হলো তিনটিই। যারা দেখল সকলে ধন্য ধন্য করল। ক্রমে সমস্ত দিদিমণিদের কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল ও।

তাই বেশ কিছুদিন ধরে পার্থজিৎ স্কুলে আসছে না দেখে সকলের মতো জয়তীদিও উদ্বিগ্ন হলেন। ভাবলেন, কিভাবে খবর নেওয়া যায় ছেলেটির! নাম ডাকা শেষ করে পড়ানো শুরু করে দিলেন তিনি। পড়ানো শেষ করে যখন বেরোতে যাবেন, ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়তে তখনও মিনিট তিনেক বাকি, এমন সময় দারোয়ান রামশরণ নিয়ে এলো নোটিশটি।

কিসের নোটিশ?

জয়তীদি পড়তে লাগলেন, আমাদের বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র পার্থজিৎ রায় ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে সম্প্রতি নীলরতন সরকার হাসপাতালের হেমাটোলজি বিভাগে ভর্তি হয়েছে। এই দুরারোগ্য রোগের হাত থেকে ওকে সুস্থ করে তোলার জন্য তোমরা যে যা পার আর্থিক সাহায্য এনে বড়দির কাছে জমা দিও।

নোটিশটি আবার পড়লেন জয়তীদি। ক্যান্সার, যার মানে মৃত্যু ওর শিয়রে দাঁড়ানো। আপনা থেকেই চোখ দুটি জলে ভরে উঠল তাঁর। একটু ধাতস্থ হয়ে প্রত্যেককে সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ক'দিনেই অনেক টাকা উঠল। পাঁচ টাকা, দশ টাকা এনে দিল অনেকে। সব টাকা একত্রিত করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ওর বাবার কাছে। কিন্তু না, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, পার্থজিৎকে বাঁচানো গেল না। ফুলে ফুলে ঢাকা ওর ছোট্ট ফুলের মতো দেহটা যখন স্কুলে আনা হলো, তখন কারও চোখের জল বাঁধ মানল না। ছাত্ররা কাঁদল। কাঁদলেন ওর শিক্ষিকারাও,

জানো কী!

- অন্ধকারের মধ্যেই লক্ষ্য করল, কেউ এক দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। হ্যাঁ, মানুষের মতোই তো মনে হচ্ছে। চোর ডাকাত নয় তো! নাকি...ভয়ে কেঁপে উঠল সে। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু...
- শুনসান রাস্তা। দু'পাশে ধানের ক্ষেত। পাগলা হাওয়া বয়ে চলেছে ক্ষেতের ওপর দিয়ে। কাঁচা রাস্তা থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধুলো উঠছে। হঠাৎ ক্ষেতের মধ্যে থেকে কে যেন ডেকে উঠল, পঞ্চা...এই পঞ্চা...
- ক্ষেপে উঠেছে হাতির দল। মানুষের চিৎকার, কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ, পটকার শব্দ...কিছুতেই কিছু হলো না। হাতির দল রাগে অন্ধ হয়ে তছনছ করতে লাগল ক্ষেতের ফসল। আর স্থির থাকতে পারল না রমেশ পাধান। হাতে তুলে নিল তার রাইফেল...
- প্রতিবেশী দুই রাজ্য। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। যুদ্ধ লেগেই থাকে। এমনি এক যুদ্ধের মধ্যে আচমকা ঘটে গেল অতি আশ্চর্য সেই ঘটনাটা...
- ব্ল্যাক ক্যাট এবার এক ভয়ঙ্কর লড়াই-এর মুখে। কে জিতবে শেষ পর্যন্ত...

এই সব প্রশ্নের উত্তর পাবে শুকতারার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। সেই সঙ্গে আরও এমন অনেক কিছু যা তোমাদের চমকে দেবেই।

যাঁরা ওর মধ্যে এক বিরাট সম্ভাবনাকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

সেই শোকাচ্ছন্ন পরিবেশে দেখা গেল না শুধু একজনকে—জয়তী মিস। কোথায় তিনি?

টিচার্স রুমে গিয়ে দেখা গেল, জয়তীদি একটা কাগজে কী যেন লিখছেন। চোখ-মুখ থমথমে। যেন বাদল মেঘ জমেছে মুখে।

আপনি পার্থজিৎকে দেখতে যাবেন না দিদি? একজন ছাত্রের প্রশ্নে চমকে তাকালেন তিনি। অস্ফুটে বললেন, হ্যাঁ যাব।

জয়তীদি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হাতে লেখা কাগজটা নিয়ে ছলছল চোখে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রিয় ছাত্রের সামনে। ধীরে ধীরে ওর গায়ের ওপর রেখে দিলেন কাগজটা। তাতে লেখাঃ

আমরা হেরে গেলাম পার্থ। ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে পড়বার আগেই তুমি ঝরে গেলে। তোমার ফুটে ওঠা আমাদের দেখা হলো না। তোমার হতভাগ্য সহপাঠী ও শিক্ষিকারা।

গুরুদাস বাগুই স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার

দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

গোলাপ কুঁড়ি

পল্লবী সেনগুপ্ত

বিছানায় শুয়ে শুয়ে গাছটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল গোলাপ। গতবার বর্ষায় রথের মেলা থেকে কিনে এনে ঐ গোলাপ গাছটা নিজের হাতে লাগিয়েছিল ও। তার পরদিন থেকেই গাছটায় নিয়মিত জল দেওয়া আর গাছটায় কুঁড়ি এল কিনা তা দেখা গোলাপের একটা নিত্য কাজ হয়ে গেছে। তবে আজ দিন দশ হলো গাছটায় মা-ই জল দিচ্ছেন। ও ক'দিন ধরে একটু বেশি অসুস্থ কিনা।

হঠাৎ কার আলতো হাতের স্পর্শে সম্বিৎ ফিরে পেল ও। বুঝতে পারল মা। তাই উঠে বসতে চেষ্টা করল। মা ওকে বাধা দিয়ে বললেন, না গোলাপ, এখন উঠিস না। তারপর হাসিমুখে যোগ করলেন, তোর জন্য সুখবর আছে। তোর লাগানো ঐ গাছটায় এইটুকু ছোট্ট একটা কুঁড়ি এসেছে। কুঁড়িটা এবার আস্তে আস্তে বড় হবে, তারপর একদিন সুন্দর টুকটুকে ফুল হয়ে ফুটবে। গোলাপ বলল, ফুলটা ঠিক ফুটবে তো মা? ফোটার আগেই কুঁড়িটা ঝরে যাবে না তো? মা বললেন, ও কি কথা! ঝরবে কেন? এমন কথা বলছিস কেন তুই? গোলাপ তার নিস্পৃহ গলায় উত্তর দিল, জানি না কেন? আমার মন বলছে গাছের ঐ প্রথম কুঁড়িটা থেকে ফুল ফুটবে না। প্রথম ফোটা ফুলটা বোধহয় আমি দেখতে পাব না। মা একটু উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মেয়ের দিকে। তারপর বললেন, ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আমি নিয়ে আসছি।

ওষুধের সঙ্গে সম্পর্ক বোধহয় কোনোদিনই ছিন্ন হবে না গোলাপের। ওর যবে থেকে জ্ঞান হয়েছে এই ওষুধ ছাড়া ওর একটা দিনও কাটেনি। কেন যে ওকে এত ওষুধ খেতে হয় তা ও বহুবার জিজ্ঞাসা করেছে বাবা-মাকে। কিন্তু কোনো সদুত্তর পায়নি। তবে হঠাৎই ডাক্তারবাবুর কিছু ভাসা ভাসা কথা ও শুনতে পেয়ে গিয়েছিল। তাতে ও ঝাপসা ভাবে কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারে। জন্ম থেকেই নাকি ওর হার্টে ফুটো আছে। ও বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ফুটোটাও নাকি ক্রমশ বড় হচ্ছে। মাঝে মাঝেই ওর শরীর খারাপ খুব বাড়ে। ও শুনেছিল যে ওর হার্ট নাকি অপারেশন করতে হবে। তা না হলে হয়তো ও...। ও

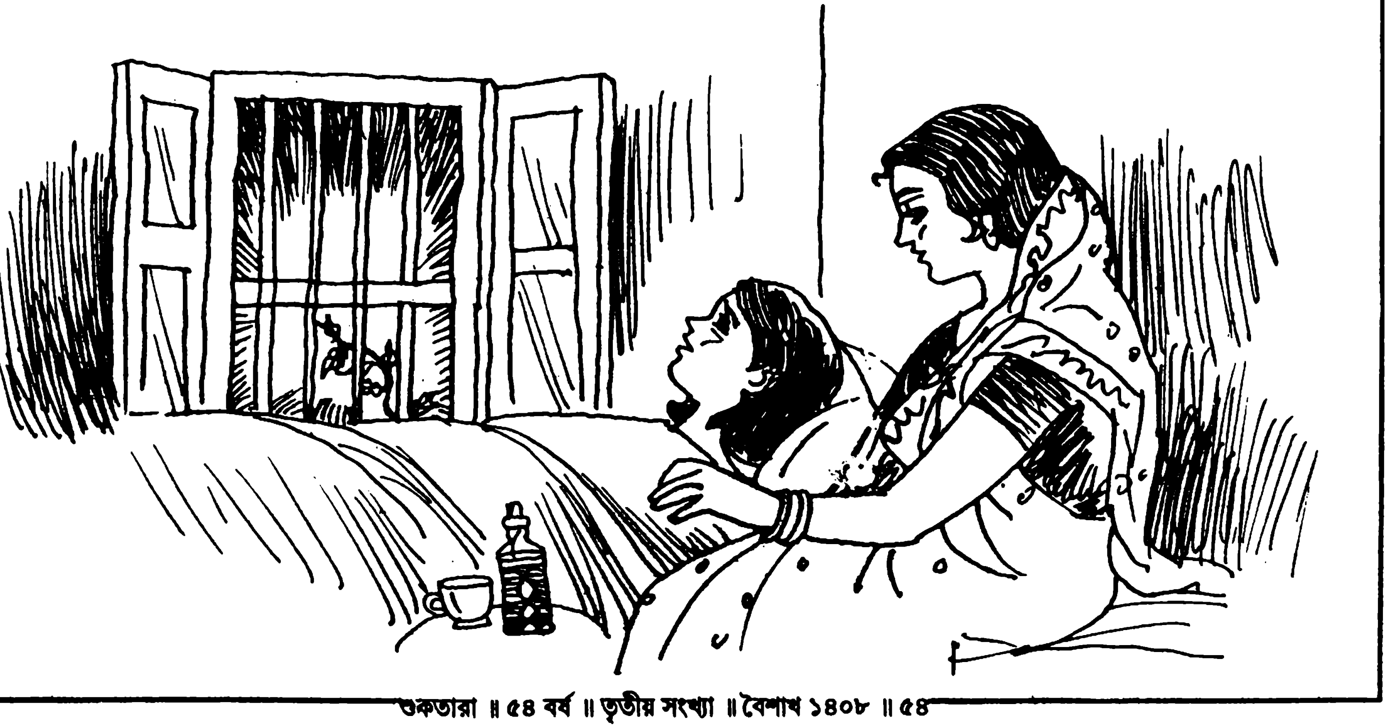

এখন ক্লাস ফোরে পড়ে। এতদিনের স্কুল জীবনে ও কোনোদিন অন্য বন্ধুদের মতো ছুটতে, খেলতে পারেনি, আর বোধহয় পারবেও না। ও এখন বুঝতে শিখেছে অনেক কিছু। বুঝতে পারে যে ওদের সংসারে বাবা ছাড়া আর কেউ কোনো রোজগার করেন না। বাবার যা রোজগার তাতে সংসার চালিয়ে ওর চিকিৎসার জন্য টাকা খরচ করা তাঁর পক্ষে অসাধ্য। ওর অপারেশন করতে নাকি অনেক টাকা লাগবে। তার জন্যই সেটা এখনও করা যাচ্ছে না।

গাছটায় কুঁড়ি এসে সেটা চারদিনে বেশ বড় হয়ে গেছে। আজ বোধহয় ফুটে যাবে ওটা। কিন্তু আর এক গোলাপের অসুস্থতা যে আজ বাড়াবাড়ি পর্যায়ে। সারাটা দিন ঘোরের মধ্যে রয়েছে, চোখ মেলে তাকাতেই পারছে না ভালো করে। ডাক্তার খালি আসছেন বাড়িতে। বলছেন গোলাপকে এখনই হাসপাতালে নিতে হবে। নইলে আর বাঁচানো যাবে না ওকে। টাকা যোগাড় করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন শশধরবাবু। ভীষণ ঝড়বৃষ্টিও শুরু হয়েছে আজ আবার। হঠাৎ শ্বাস টানতে আরম্ভ করে গোলাপ। কী হলো গোলাপের, ভয় পেয়ে যান মা। বাবাও যে বাড়িতে নেই। কোনোকিছু না ভেবে মা খুলে দেন জানলাটা। চোখ যায় গাছটার দিকে। একি! কুঁড়িটা তো দেখা যাচ্ছে না। কোথায় গেল ওটা? তবে কি সত্যি ঝরে গেল? সেই মুহূর্তেই চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আলোতে। আর প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ল বাজ।

চার-পাঁচদিন পরে আবার একটা ছোট্ট কুঁড়ি এসে দেখা দিয়েছে গাছটায়। কিন্তু এটা ফুটলে আনন্দ পাবার মতো কেউ আর নেই আজ।

এছাড়াও যাঁদের লেখা ভালো হয়েছেঃ

চিন্ময় চক্রবর্তী (বেলদা, মেদিনীপুর)॥ উজ্জ্বল আচার্য (পায়রাচলি, মেদিনীপুর)॥ দিবাকর সরকার (নিরঞ্জনপল্লী, হুগলী)॥ মৌমিতা দত্ত (কাটাডাঙা নেতাজীপল্লী, হুগলী)॥ বাবলু দে (শ্রীখণ্ডা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা)॥ সুজিত কুমার পাত্র (আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ)॥ বিশ্বনাথ ঢ্যাং (বল্লভপুর, মেদিনীপুর)॥ শতাব্দী চ্যাটার্জী (বেকারী রোড, কলকাতা-৫৬)॥ মন্দিরা চট্টোপাধ্যায় (শ্রীপল্লী, আসানসোল)॥

বিশেষ পুরস্কার

এখন তোমরা আরো পুরস্কার পাচ্ছো। আমাদের লেখক ও বৈজ্ঞানিক ডঃ ডি চন্দ্র তাঁর প্রয়াত পুত্র দেবাশিসের নামে স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার সেরা পাঁচজন লেখককে তাঁর লেখা বই পুরস্কার হিসেবে দেবেন।

এ মাসের পুরস্কারপ্রাপকরাঃ সমীর কুমার ঘোষ, পল্লবী সেনগুপ্ত, চিন্ময় চক্রবর্তী, উজ্জ্বল আচার্য ও দিবাকর সরকার।

ছবিঃ সুফি

ঘোষণা

মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে জয়ন্ত দাস তাঁর প্রয়াতা স্ত্রী সুলেখা (টুটুন) দাসের নামে একটি স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর প্রস্তাব মতো আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে সুলেখা দাস স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে মৌলিক লেখা চাইছি।

সুলেখা (টুটুন) দাস

বিষয়বস্তু

ভাগ্য

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ১৫ জ্যৈষ্ঠ। পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার ভাদ্র সংখ্যায় ছাপা হবে।

প্রথম পুরস্কারঃ ১০০ টাকা □ দ্বিতীয় পুরস্কারঃ ৫০ টাকা

ব্ল্যাক ক্যাট (পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ওরা গিয়ে ঢুকল সেই পরিত্যক্ত দুর্গে....
ব্ল্যাক ক্যাট লুসিফার মাফিয়াদের ডেরায় খুঁজতে থাকে তার আসল শত্রুকে.....
আরও একটা দরজা
?
দেখি কী আছে....?
?
হাঃ হাঃ হাঃ!
আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। এসো.... ভিতরে এসো, আমার পুরোনো বন্ধু....স্বচ্ছন্দে এসো...
???
গিলবার্ট স্বাগত জানায় তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে.....
?!
এ কী রাম! তোমায় এত বিচলিত দেখাচ্ছে কেন?
গিলবার্ট....তুমি!

[চলবে]

মগলু কাহিনী

নিরঞ্জন সিংহ

অমরকন্টকের মগলুর কথা আমাদের বাঙলা দৈনিক 'জবর খবর'-এ খুব ছোট্ট করে বের হলেও খবরটা কিন্তু বিজ্ঞানীমহলে যথেষ্ট কৌতূহলের সৃষ্টি করল। কলকাতার বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডঃ পুরোহিত ওঁর কয়েকজন সহকারীর সঙ্গে গোপনে আলোচনা সেরে নিলেন। ঠিক হলো পরদিনই একটি বিজ্ঞানী দল প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে অমরকন্টকে যাবেন। সঙ্গে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকেও নেওয়া হবে মগলুর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। আমাদের কাগজের করিতকর্মা সম্পাদক হর্ষদার ব্যবস্থাপনার দৌলতে আমি আর আলোকচিত্রশিল্পী কবীরও ওই দলে ঢুকে পড়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম। কবীর তো দারুণ খুশি। অমরকন্টকে বেড়ানো আর ছবি তোলা হবে এই ভেবে। আমিও খুশি এমন একটা বৈজ্ঞানিক অভিযানে যোগ দিতে পেরে।

মহাকাল (মৈকাল) পাহাড়ের সব থেকে উঁচু জায়গা অমরকন্টক। নর্মদার উৎস এখানে। শোন নদের উৎসও কাছাকাছি। আগে ছিল মধ্যপ্রদেশ, এখন নতুন রাজ্য ছত্তিশগড়।

পরদিন বিকেল নাগাদ আমরা অমরকন্টকে পৌঁছে গেলাম। হোটেলে একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে আমরা চললাম মগলুকে দেখার জন্য। হোটেলের একটা বয় আমাদের নিয়ে গেল কাছেই একটা আদিবাসী গাঁয়ে।

মগলুকে দেখে আমরা রীতিমতো চমকে উঠলাম। জরাগ্রস্ত একটি মানুষ, অথচ ওর বয়েস বছর কুড়ি। মগলু খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল তাও কথার ফাঁকে ফাঁকে হাঁফাচ্ছিল। তবু ওর কাছ থেকে যা জানতে পারলাম তা হচ্ছে মগলু পাখি শিকার করার জন্য জঙ্গলে ঢুকেছিল। কপিলধারার রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা যাওয়ার পর বড় রাস্তা ছেড়ে ডানদিকে নেমে গিয়েছিল। এ জঙ্গলে অনেকবার এসেছে মগলু। এদিকে গাছে গাছে নানা রকম পাখি আর ঝোপঝাড়ে বনমোরগ, ডাক ও খরগোশ প্রভৃতি পাওয়া যায়। মগলু জানায় পাখি মারবে বলে তীর-ধনুক তুলে গাছের মাথার দিকে তাকাতে তাকাতে ও এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ও খেয়াল করল যে কোনো গাছে পাখ-পাখালির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। জঙ্গলের মধ্যেও বনমোরগ বা খরগোশের কোনো সাড়াশব্দই নেই। সব যেন কেমন নিস্তব্ধ। ওর গাটা ছমছম করে উঠল। তবু ও ভয়ে না পালিয়ে বরং জঙ্গলের গভীরে এগিয়ে চলল।

এইভাবে আরো কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর সূর্যের আলোয় ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সামনের অনেকটা জায়গা জুড়ে জঙ্গলটা পুড়ে গেছে। অনেকগুলো

পোড়া গাছ পড়ে আছে মুখ থুবড়ে। আর আশপাশের বহু গাছ পাতাহীন ন্যাড়া। গাছগুলো সব মরে গেছে। এতক্ষণে মগলু একটু ভয় পেল। এরকম ভয়ানক [illegible] সে কোনোদিন চোখে দেখেনি। কোথায় এসে পড়েছে ও? ওর অতি পরিচিত জঙ্গল হঠাৎ এরকম হয়ে গেল কি করে? এসব ভাবতে ভাবতে আরো খানিকটা এগিয়ে যেতেই শুরু হলো একটা শারীরিক অস্বস্তি। মাথা ঘুরতে লাগল, গা বমিবমি করতে লাগল। এবার মগলু ভয় পেয়ে গেল। সামনের দিকে আর না এগিয়ে ও পিছু ফিরে দৌড় লাগাল। কিন্তু দৌড়ুতে পারল না। কিছুটা ছুটে এসেই একেবারে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারপর আর কোনো হুঁশ ছিল না ওর। যখন হুঁশ ফিরল তখন ও নিজের হাত-পায়ের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল। মাটি থেকে কোনোমতে উঠে ও গাঁয়ের দিকে ছুটতে শুরু করল, কিন্তু পারল না। শরীরে যেন একদম জোর নেই। আস্তে আস্তে বলতে গেলে প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে ও গ্রামে ফিরে এল। আর তখনই শুরু হলো আসল সমস্যা। গাঁয়ে ফিরলেও গাঁয়ের কেউ ওকে মগলু বলে চিনতে পারল না। গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনল তিনদিন আগে মগলু জঙ্গলে শিকার করতে বেরিয়েছে; কিন্তু এখনো ফিরে আসেনি। ও যতই নিজেকে মগলু বলে পরিচয় দেয় ততই লোকে ওর কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা করে কারণ মগলু নামের যুবকটির চেহারা তখন যেন শতবর্ষের জরাগ্রস্ত কোনো অমানুষের মতো। অনেকেই তো ওর চেহারা দেখে ভয়ে আঁতকে উঠেছিল। একটা জোয়ান ছেলে জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে এরকম বীভৎস চেহারা নিয়ে ফিরে এল—এ কি সম্ভব? এ নিশ্চয় কোনো অপদেবতার কাজ। কিন্তু সব সন্দেহের নিরসন ঘটল যখন মগলুর বাবা মগলুর গলার তক্তি ও বাঁ হাতের মাদুলি দেখে ওকে শনাক্ত করল আসল মগলু বলে।

বাপ মগলুকে চিনতে পারলেও গাঁয়ের লোক দোটানায় রইল। সবার ধারণা এ কোনো অপদেবতার কারসাজি। মগলুর অবস্থা দেখে মগলুর মা তো কেঁদেকেটে ভাসাল। অবশেষে মোড়ল বলল, 'ওঝা ডাকা হোক।'

ওঝা এল। সবকিছু দেখেশুনে ওঝাও ঘাবড়ে গেল। তবু ওঝাদের নিয়মমাফিক যা যা করার দরকার তা করতে শুরু করে দিল। ঝাঁড়ফুক, সর্ষেপড়া, ঝাঁটার বাড়ির আঘাতেও মগলুর দৈহিক কোনো পরিবর্তন হলো না। বেগতিক বুঝে তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে ওঝা বলল, 'আমার পাওনাটা দাও গো কর্তা। এ অপদেবতা নামানো আমার কম্ম নয়।'

এরপর স্থানীয় ডাক্তারবাবুকে ডাকা হলো। তিনি সব দেখেশুনে মগলুর চেহারা পরিবর্তনের কোনো ব্যাখ্যাই অবশ্য দিতে পারলেন না। চিকিৎসারও কোনো ব্যবস্থা করে উঠতে পারলেন না। কিছু মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট খেতে দিয়ে মগলুর বাপকে বললেন, 'জব্বলপুর কি কলকাতা নিয়ে যাও মগলুকে। ওসব জায়গা ছাড়া ওর চিকিৎসা এখানে করা সম্ভব নয়।'

বিজ্ঞানী ও ডাক্তারবাবুরা মগলুকে ভালভাবে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে মগলুর অবস্থার জন্য দায়ী কোনো শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় বিকিরণ, যা ওর দেহকোষের 'জিন'কে অদ্ভুতভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু ডঃ পুরোহিত একটু অবাক হলেন, অমরকণ্টকের জঙ্গলের মধ্যে এরকম ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয়তার উৎস এল কোথা থেকে? মগলুর জামাকাপড় ও তীর-ধনুক পরীক্ষা করেও তেজস্ক্রিয়তার হদিস পেলেন বিজ্ঞানীরা। এরপরই ডঃ পুরোহিত ঠিক করলেন সরজমিনে পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে হবে আসল ব্যাপারটা কী। মগলুকে অবশ্যই সঙ্গে নিতে হবে। ও হেঁটে যেতে পারবে না তাই একটা ডুলি মতো তৈরি করে তার উপর ওকে বসিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হলো। ডঃ

নানা স্বাদের বই

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
চারটি রুদ্ধশ্বাস গোয়েন্দা উপন্যাস এক মলাটে
কিরীটী ৪ ৪০.০০
(নিশির ডাক, রক্তমুখী ড্রাগন, রাতের আতঙ্ক ও বিষের তীর)
সাদা কালো ৫৫.০০

আশাপূর্ণা দেবীর
গল্প ভালো আবার বলো ৪০.০০

শিবরাম চক্রবর্তীর
যত হাসি ততই মজা ৪০.০০
হাসির চোটে দম ফাটে ৫২.০০
হাসির ফোয়ারা ৪৫.০০ **হাসির টেক্কা** ৫৫.০০

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কেল্লা রহস্য ২০.০০ **সুড়ঙ্গ রহস্য** ২০.০০
ভাঙা বাড়ির রহস্য ২০.০০
জঙ্গল রহস্য ১৮.০০ **ফর্মুলা রহস্য** ২২.০০
পাতালঘর রহস্য ২০.০০
যাদুঘর রহস্য ২৫.০০
তীরন্দাজ ১৮.০০ **মুখোশ** ১৬.০০

ভূতের গল্প

গৌরী দের
রোমাঞ্চকর ভূতের গল্প ২৪.০০
গা ছমছমে ভূতের গল্প ২২.০০
ভূতেরা ভয়ঙ্কর ২৬.০০

শিশির কুমার মজুমদারের
অমাবস্যার রাতে ২৫.০০

মানবেন্দ্র পালের
আতঙ্ক ৩৫.০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর
অদ্ভুত যত ভূতের গল্প ২৬.০০

ভ্রমণ কাহিনী

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গুহা মন্দিরের দেবী ২৮.০০
(বৈষ্ণোদেবীর দরবারে যাবার গাইড বই)

সোমনাথের
শিবঠাকুরের বাড়ি ৩৫.০০
(দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও পঞ্চকেদার যাবার গাইড বই)

প্রণবেশ চক্রবর্তীর
এই বাংলায়
(১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতিটি ৩৫.০০

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন ☐ কলকাতা-৭০০ ০০৯

পুরোহিতকে ধরে আমি আর কবীরও দলের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি পেলাম তবে শর্তসাপেক্ষে। শর্তটা হলো ডঃ পুরোহিত যখনই বলবেন তখনই আমাদের ফিরে আসতে হবে। রাজী হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। পরদিন সকালেই রওনা হবে দলটি সেইরকম বন্দোবস্ত করে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

নর্মদার উৎস ঘিরে নর্মদা মন্দির। সন্ধ্যাবেলা হাতে কোনো কাজ না থাকায় আমি আর কবীর মন্দির দেখতে বেরুলাম। নর্মদার জন্ম ভারতের পূর্বাঞ্চলে হলেও নর্মদা গিয়ে পড়েছে পশ্চিমের কাম্বে উপসাগরে। নর্মদা উৎস থেকে বেরিয়ে একটা উপত্যকার মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে এবং মন্দির থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে অমরকণ্টকের পশ্চিমদিকে পাহাড় থেকে প্রায় ১৫০ ফুট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এরই নাম বিখ্যাত কপিলধারা জলপ্রপাত। আরো আধ কিলোমিটার দূবে আরো নিচের পাহাড়ে গিয়ে পড়েছে যার নাম দুধধারা জলপ্রপাত। নর্মদা মন্দির থেকে এক কিলোমিটার দূরে মাই-কি-বোগিয়া। বোগিয়া কথার অর্থ হচ্ছে বাগান। এখানে জঙ্গলের মধ্যে অনেক সাধুসন্তের আশ্রম। একটু ভেজা স্যাঁতসেঁতে মাটিতে এক ধরনের ঘাস বা গুল্ম জন্মায়। বড় বড় পাতা থাকে। তিন-চার ফুট লম্বা। এর নামটা খুব বিচিত্র—'গুলেবকাবলি'। সাদা সাদা ছোট ছোট ফুল, খুব সুগন্ধি। এর থেকে চোখের রোগের ওষুধ তৈরি হয়। এইসব তথ্যের যোগান দিচ্ছিল অমরকণ্টকের একমাত্র টাঙাওলা সিং। নর্মদা মন্দিরের সামনেই যার সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। বয়স বেশি নয়। তিরিশের মধ্যে। মাঝারি চেহারা। ব্যবহার অমায়িক। বলল, 'স্যার, গুলেবকাবলি এই অমরকণ্টক ছাড়া আর কোথাও জন্মায় না।'

'তাই নাকি?' আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ, স্যার! আমার অবশ্য সাধুদের

মুখে শোনা।'

আমরা সিং-এর টাঙায় করে হোটেলে ফিরছিলাম। আসলে অল্প পথ আমরা হেঁটেই আসতাম কিন্তু সিং ছাড়ল না।

'আমি আপনাদের সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব স্যার।' হাসিমুখে বলল সিং। টাঙা চলছে মন্থর গতিতে। শহুরে শ্রোতা পেয়ে সিং প্রাণ খুলে গল্প জুড়ে দিয়েছে। সময় কাটাবার জন্য আমাদেরও খারাপ লাগছিল না। কবীর উৎসাহিত হয়ে উঠছিল ছবি তোলার লোভে।

আমি বললাম, 'সিং আমরা যে ব্যাপারে এখানে এসেছি সেসব মিটে গেলে অমরকণ্টকটা ভাল করে দেখে তবে কলকাতায় ফিরব।'

সিং একমুখ হেসে হাতের চাবুকটা হাওয়ায় ঘুরিয়ে একরকম শব্দ তুলতেই ঘোড়াটা একটু জোরে চলতে শুরু করল।

'স্যার, আপনারা মগলুর ব্যাপারে এসেছেন তাই একটা কথা আপনাদের বলতে ইচ্ছে করছে।'

'বলো না', আমি ওকে উৎসাহ দিলাম।

'স্যার, এর সঙ্গে মগলুর ব্যাপারের কোনো যোগাযোগ আছে কি-না তা বলতে পারব না। তবে ব্যাপারটা আমার কাছে খুব আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছিল।'

'কি ব্যাপার?' আমি আবার জানতে চাইলাম।

'স্যার! মাস ছয়েক আগে অমরকণ্টক থেকে বেশ রাতে কাজকর্ম সেরে গাঁয়ে ফিরছিলাম। তখন শীতকাল। চারিদিক শুনসান। হঠাৎ যেন চোখ ধাঁধিয়ে গেল। মনে হলো একটা ছোটখাটো আগুনের গোলা আকাশ থেকে অজগর সাপের মতো হিসহিস শব্দ করতে করতে জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়ল। দেখুন স্যার, অমরকণ্টকের মতো শান্ত নিরিবিলি ছোট্ট একটা জায়গায় এরকম কিছু ঘটা সত্যি আশ্চর্যজনক তাতে সন্দেহ নেই। ব্যাপারটা নিয়ে আমি দু'চার জনের সঙ্গে কথাও বলেছিলাম, কিন্তু কেউ আমার কথা বিশ্বাস করেননি। তাই এরপর আমিও আর কাউকে কিছু বলিনি। মগলু কিন্তু স্যার ওই জঙ্গলেই শিকার করতে গিয়েছিল।'

এবার সিং-এর কথায় আমরা দু'জনেই চমকে উঠলাম। মনে হলো বিষয়টা ডঃ পুরোহিতকে জানাতে হবে।

বললাম, 'সিং তোমার কথা আমাদের বিজ্ঞানীদের জানাব। ওঁদের কাজে লাগতেও পারে।'

সিং খুব খুশি হলো আমরা ওর কথা বিশ্বাস করেছি ও গুরুত্ব দিয়েছি বলে।

ইতিমধ্যে আমরা হোটেলের সামনে এসে গিয়েছিলাম। সিং টাঙা দাঁড় করাতেই নেমে পড়লাম। সিং কথা দিয়ে গেল ও আমাদের অমরকণ্টক ঘুরিয়ে দেখাবে।

হোটেলে ফিরেই আমি ডঃ পুরোহিতকে সিং-এর কথা জানালাম। সব

শুনে ওঁর ভ্রূ কুঁচকে উঠল। কিছু একটা বলতে গিয়েও চেপে গেলেন বলে মনে হলো।

পরদিন সকালে মগলুকে সঙ্গে নিয়ে অভিযানে বেরুল দলটি। কপিলধারার রাস্তা ছেড়ে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে ডানদিকের জঙ্গলে ঢুকলাম আমরা সবাই। আমি ঘড়ি দেখলাম, নটা বাজে। একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। ফাঁকা ফাঁকা ছোট ছোট গাছের জঙ্গল। তার মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে চলার পথটি ধরে আগুপাছু করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। আমি আর কবীর লাইনের একেবারে শেষ প্রান্তে। যত ভিতরে ঢুকছিলাম জঙ্গল তত ঘন হচ্ছিল। এদিককার গাছগুলোও বেশ বড় বড় আর লম্বা। নিচে ছোট ছোট গাছের ঝোপঝাড়। তার ভিতর দিয়ে সরু রাস্তা। এখানে সূর্যের আলো ভালভাবে ঢুকছে না। আধো আলো আধো অন্ধকার। খুবই ধীর গতিতে চলতে হচ্ছিল আমাদের। মগলুকে নিয়ে দলে আমরা ন'জন। ডঃ পুরোহিত, ওঁর তিনজন সহকারী, মগলু আর ওর ডুলি বহনকারী দু'জন আর আমরা দু'জন। ডাক্তাররা আসেননি।

প্রায় আধঘণ্টা চলার পর হঠাৎ সূর্যের আলোয় আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সামনে বেশ কিছুটা জায়গায় আর কোনো গাছ নেই। একটা বিশাল এলাকার গাছগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর আশপাশের গাছগুলো মরে গেছে। একটা পাতার চিহ্নও নেই। যেন শয়ে শয়ে কঙ্কাল দু'হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যের আলো সরাসরি এসে পড়েছে গাছগুলোর উপর। সে এক বীভৎস দৃশ্য। কবীর ছবি তোলার জন্য ঝোপঝাড় ভেঙে এগিয়ে গেল। বিজ্ঞানীদের হাতে ধরা তেজস্ক্রিয়তা মাপার যন্ত্র 'গাইগার কাউন্টার' থেকে বিশ্রী কটকট আওয়াজ বেরুতে শুরু করেছে। আওয়াজ ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হতেই ডঃ পুরোহিত গোটা দলকে থামিয়ে পিছু হটার নির্দেশ দিলেন। আমরা পিছু হটতে শুরু করলাম। 'গাইগার কাউন্টার'-এর শব্দ যখন একেবারে কমে এল তখন ডঃ পুরোহিত সবাইকে থামতে নির্দেশ দিয়ে আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'জয়ন্তবাবু এবার আপনাদের ফিরতে হবে। মগলুও ফিরে যাবে। আমরা জায়গাটা ভালভাবে পরীক্ষা করে তবেই ফিরব।'

'কিছু বোঝা যাচ্ছে ডঃ পুরোহিত?' আমি জানতে চাইলাম।

'তেজস্ক্রিয়তার উৎসটা এখানেই রয়েছে মনে হচ্ছে। ওটা আপনার সিং-এর বর্ণনামতো কোনো উল্কাখণ্ড হলেও অবাক হব না। যাহোক, এবার আপনারা দয়া করে ফিরে যান।' বলে ডঃ পুরোহিত ও ওঁর তিনজন সহকারী ওঁদের সঙ্গে করে আনা স্পেসস্যুটের মতো দেখতে স্যুট পরে নিলেন। এবার ওঁরা তেজস্ক্রিয়তার উৎস সন্ধানে আবার এগিয়ে যাবেন। আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। মগলু এবং ওর ডুলিওয়ালারাও ফিরে চলল।

আমি আর কবীর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠে এলাম। ভাগ্য ভাল দূর থেকে সিং-এর টাঙাটাকে আসতে দেখলাম। খুব সম্ভবত কপিলধারায় যাত্রী নামিয়ে অমরকণ্টকে ফিরছে। আমাদের দেখতে পেয়ে সিং খুশি হয়ে টাঙা থামিয়ে আমাদের দু'জনকে তুলে নিল।

আমি বললাম, 'সিং তোমার কথা আমাদের দলনেতাকে জানিয়েছি।'

সিং যেন এতটা ভাবতে পারেনি। বলল, 'স্যার আপনাকে ধন্যবাদ!' ওই দিনই আমরা সিং-এর টাঙায় কপিলধারা, দুধধারা, মাই-কি-বোগিয়া, শোনমুড়া ঘুরে দেখলাম। সিং আমাদের গুলেবকাবলি গাছ ও ফুলও দেখাল। আমরা ওর কাছে কৃতজ্ঞ।

এর পরের খবরটুকু সবাই ইতিমধ্যে আমাদের 'জবর খবর'-এর মাধ্যমে জেনে গেছেন বলেই আমার বিশ্বাস। তবু যদি কেউ 'জবর খবর' না পড়ে থাকেন তাঁদের জন্য ছোট্ট করে জানাচ্ছি যে ডঃ পুরোহিতের দলটি জঙ্গলের ওই পোড়া জায়গাটায় প্রায় পাঁচ কিলোগ্রাম ওজনের একটি উল্কাপিণ্ড খুঁজে পান। এই উল্কাপিণ্ডটাই ছিল ওই ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয়তার উৎস। মগলুর বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী ওই উল্কাপিণ্ডের তেজস্ক্রিয়তা। ডঃ পুরোহিত প্রাথমিকভাবে ধারণা করেছেন যে এটা হয়তো কোনো গ্রহাণুর ভাঙা টুকরো। আমাদের আবহাওয়ামণ্ডলের ঘর্ষণজনিত ক্ষয়ক্ষতি এড়িয়ে মাটিতে এসে পড়েছে। ইতিমধ্যে উল্কাপিণ্ডটাকে ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার নিয়ে গেছেন আরো গবেষণার জন্য। আর মগলুকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দিল্লীর অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সে। মগলুর 'জিন' মানচিত্র বা 'জিনোম' বিশ্লেষণ করে ওকে দ্রুত সুস্থ করে তোলার কাজ শুরু হয়ে গেছে।

মগলু তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুক ভগবানের কাছে আমরা এই প্রার্থনা জানাই।

ছবি ঃ সুফি

আবিষ্কার • দীপক কুমার রায়

বায়ু-শোধক যন্ত্র

'লিভিং-সেফ-প্রোডাক্টস' কোম্পানি 'রাইট-এয়ার' নামে একটি নতুন যন্ত্র বের করেছে। ধূমপানে দূষিত দেড়শ স্কোয়ার ফিট স্থানে কিছু নেগেটিভ বিদ্যুৎকণা ছড়িয়ে দেয় যন্ত্রটি। সেগুলো ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে ধোঁয়াকে ভারী করে তোলে ও ধীরে ধীরে মাটিতে থিতিয়ে পড়ে। ফলে বায়ু ধোঁয়ামুক্ত হয়। বিচিত্র এই যন্ত্রটির মূল্য ছশো নব্বই টাকা।

মজার পাতা

নতুন শব্দমালা

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. শ্বাসকষ্ট জনিত অসুখ ৩. আজকালকার ৬. অভিনেত্রীকে পাবে উদ্যানে ৮. কুলকীর্তি গায়ক ১০. লিপিবদ্ধ করা ১২. বর্ণাশ্রমের প্রথমজন ১৪. গভীর জলাশয় ১৫. পদবী বিশেষ ১৭. নির্যাস ১৯. সুদ ২১. কানের অলঙ্কার ২৩. একমাত্র কলকাতায় দেখা মেলে এই দ্বিচক্রযানের ২৫. আখড়ায় হয় ২৭. কণামাত্র চাল ২৯. প্রাপ্ত ৩০. অজয় যা ৩২. বিতরণ করা ৩৪. কৃষ্ণবর্ণ ৩৬. কাব্যালঙ্কার ৩৭. পর্ণকুটির

উপর-নিচ ঃ ১. একটি বাঁকের উপকথা ২. বিয়ে তবে হিন্দুর নয় ৩. চেতনা ৪. কাটা সরু ডাল ৫. কুকুরের এই ইন্দ্রিয়টি খুব প্রবল ৭. কিনতে গেলে লাগে ৯. কলকাতার একটি থিয়েটার হল ১১. খিদে পেলে খাই ১৩. পত্রিকাটি বিদেশবাসী ১৬. অনবরত ঘটে ১৭. অন্ধ্রপ্রদেশের বিখ্যাত ভ্রমণস্থল ১৮. স্বল্পতম বিরামচিহ্ন ২০. পর্বতগুহা ২২. কলরব ২৪. উচ্চারিত ২৬. কমে আসা ২৮. সশব্দে পতন ৩১. খোলামেলা মন ৩২. চাঁদ ৩৩. সুন্দরী নারী ৩৪. শক্তির এক নাম ৩৫. এটি রাঁধতে হয় চিংড়ি দিয়ে

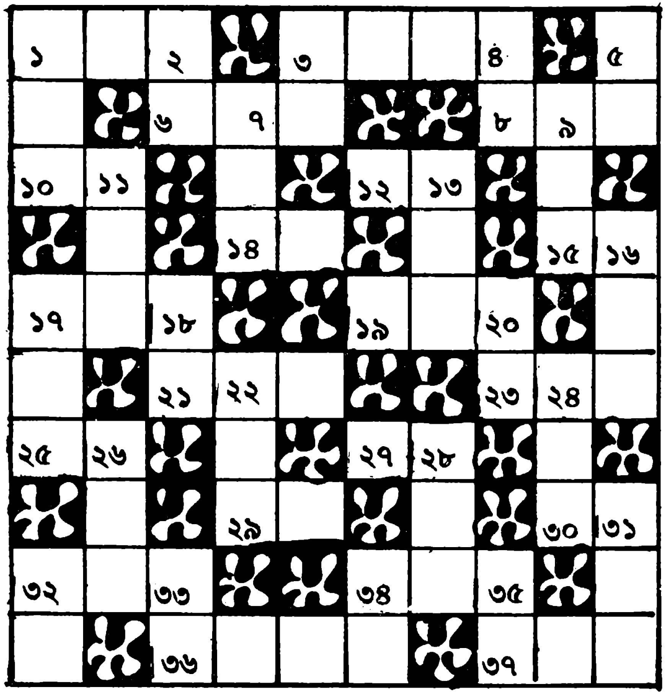

এটি তৈরি করেছেন ডাঃ স্বপনকুমার গোস্বামী, আলিপুর, কলিকাতা-২৭

এ মাসের প্রশ্ন

পাশে দেওয়া ছবিটি দেখো আর নিচের শূন্যস্থান পূরণ কর ॥

- বাড়িটির নাম .... সোসাইটি
- .... সালে এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন ....

? ? ?

নতুন ধাঁধা

মজার পাতা

বিকির মজার অঙ্ক

নিচের চিত্রিত অংশটি বিকির চার বন্ধু মিলে সমান চার ভাগে ভাগ করতে চায়, চৌকো অংশ হলে ভাগ করা খুব সহজ কিন্তু এটি ভাগ করতে গিয়ে চার বন্ধুর হিমসিম অবস্থা।

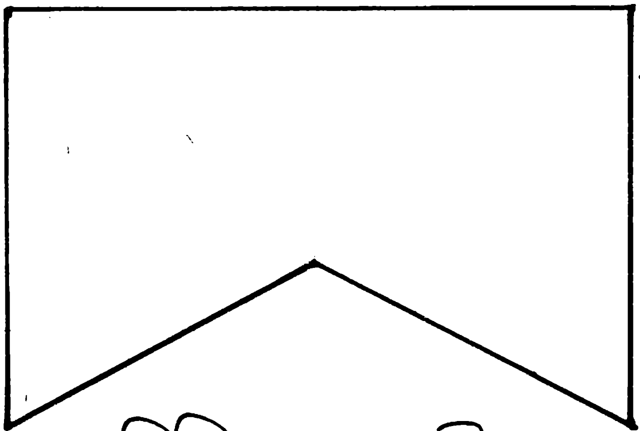

এখন দেখতো তুমি এর সমাধান করতে পারো কিনা। মনে রাখবে ভাগ করা অংশের জ্যামিতিক নকশা যাই হোক, আয়তন বা ক্ষেত্রফল চারটি অংশে একদম সমান ॥

১. দংশক প্রাণী নয়
পেলে সুখনিদ্রা হয়।
ডাঃ রামপ্রসাদ ধঁক
ও দেবিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
দাসদীঘি/বাঁকুড়া

২. লেজ ছাড়া সুতো পাবে
সোনা কিংবা রুপো হবে
আগা-গোড়া কর স্তব
নিরীক্ষা যদি নাও সব।
সৌমিত্র, সুষমা, দেবু
গৈরা/বাঁকুড়া

৩. কোঠরে থাকে পেঁচা নয়
পাতা আছে গাছ নয়
জলে আছে মাছ নয়
উত্তর কি মহাশয়?
বিশ্বজিৎ দে
অম্বিকানগর/বাঁকুড়া

৪. মিলেমিশে তিন বর্ণ
পুষ্প হয়ে ফোটে
মধ্যম বাদে খেলার সঙ্গী
ফলটি পাবে আগা কেটে।
দিলীপ চট্টোপাধ্যায়
সল্টলেক/কলকাতা

চৈত্র সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তরঃ

১. জাপান ২. বাতাস ৩. মারণ ৪. ভূমা

ফুটকি থেকে ফুটকি

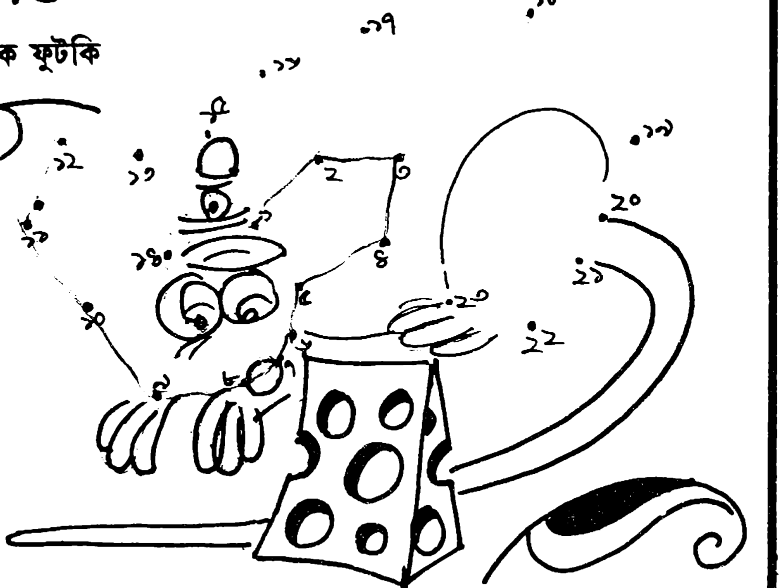

অঙ্কে মজা : উত্তর ॥

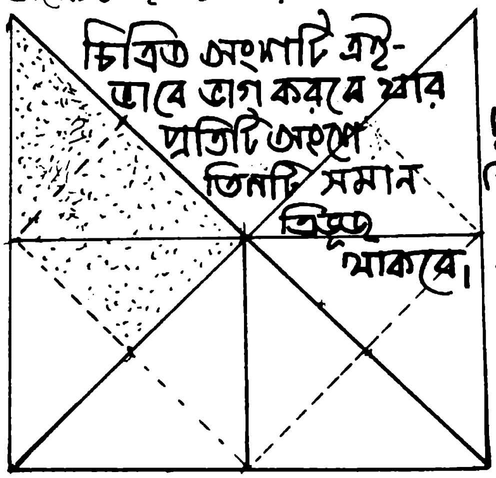

চিত্রিত অংশটি এইভাবে ভাগ করলে প্রতিটি অংশে তিনটি সমান ত্রিভুজ থাকবে।

গত মাসের মজার : উত্তর
• নৈসর্গিক সংখ্যাটি
• ১৩৮৪ ...... সবার উচিৎ জানাস

চৈত্র সংখ্যার নতুন শব্দমালার উত্তরঃ

পাশাপাশিঃ ৪. গদা ৬. শুকতারা ৭. কটক ৯. রমা ১০. হংস ১১. বকুনি ১৩. মগ ১৪. বালিকা ১৬. নীরবতা ১৭. রবি

উপর-নিচঃ ১. বালক ২. শুশুক ৩. পিতামহ ৫. দামামা ৮. টগবগ ৯. রসপুলি ১২. নিবারণ ১৩. মন্দর ১৪. বাতাবি ১৫. কানন

পৌষ সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নামঃ

॥ কলকাতা ॥

লক্ষ্মীশ্রী, শিবব্রত, রাঙারানী ও নির্মল কুমার লাই/লেকটাউন, কল-৮৯ ; তাপস, রত্না, পূবালী ও শৌভিক বসু/অটলবিহারী বসু লেন/কল-১১ ; প্রবীর, রমা, প্রিয়াঙ্কা ও প্রিয়ালী বিবাড়/পর্ণশ্রী, কল-৬০ ;

॥ বর্ধমান ॥

মিষ্টি, কুম, টিনি, তিতির, মানতা, বাপ্টু, অভিষেক, ছুটকি ও ডাঃ উত্তম কুমার বটব্যাল/দুর্গাপুর-৬ ; শতভিষা, যশোধারা, বাসবী ও ডাঃ উত্তম কুমার বটব্যাল/অলডি অফিসার্স কোয়ার্টার, অলডি ; পল্লব, রজত ও রাজেশ চট্টরাজ/রক্ষিতপুর ;

॥ মেদিনীপুর ॥

অরুণ, সুদীপ্ত মণ্ডল ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ/দেউড়িবাড় কিরণপ্রভা বিদ্যামন্দির ; পপি, পৌলমী, প্রণীতা, পিংকি, আগমনী, চিন্ময়ী, মানসী, বঙ্গশ্রী ও কাজলাগড় এম. এস. বি. সি. এম. এইচ. এস. এসের শিক্ষকবৃন্দ/কাজলাগড় ; পিকু, বুল্টি, নব, রিঙ্কি, পপি, আর্য, ঘেঁটু সর্দার, পাপু, টুনু, তুতু, নুকু, রনি, পুটু, পৌলমী, সৌরভ, শ্রীধর, শিবানী, আগমনী, মিতা, ছবি, পিংকি, তুলসী, শ্রাবণী, তনুশ্রী, প্রণতি, নিবেদিতা, সুমিতা, শুভ্রা ও সেলিনা/কাজলাগড় হাই স্কুল ;

॥ বাঁকুড়া ॥

স্নেহাংশু, চৈতালী, প্রসূন, পিয়ালী, শুভ্রাংশু, সুধাংশু, হিমাংশু, সৌমিত্র, সুদীপ, সন্দীপ, স্বপন, সোমনাথ ও তন্ময়/মটুকবনী ;

॥ হাওড়া ॥

অমিতাভ, অরুণাভ ও অরিন্দম ঘোষ/সদর বক্সী লেন ; সৌম, সৌরভ ও সোনালি ব্যানার্জী/বি. বি. হালদার লেন ; বুম্বা ও ডোরা মুখার্জী/শিবপুর ; মীরা, বিমান, রীতা, সব্যসাচী ও শতাব্দী মুখার্জী/গণেশ চ্যাটার্জী লেন, শিবপুর ;

॥ হুগলী ॥

হিমাদ্রি, ইতি, সোনালি, মৌসুমী, ফাল্গুনী, রেখা, আগমনী, জয়া, সজল, গোপাল ও মৃত্যুঞ্জয়/বিবেকপল্লী, শেওড়াফুলি ;

॥ মুর্শিদাবাদ ॥

অরুণ, সঙ্গীতা, দেবদ্যুতি ও দূর্বাদল দাস/অমর চক্রবর্তী/খাগড়া ;

॥ অসম ॥

রেশমী, গীতা ও উদয় ভট্টাচার্য/লামডিং ;

॥ কর্ণাটক ॥

রীতম ভট্টাচার্য/ব্যাঙ্গালোর।

মাঘ সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নামঃ

॥ কলকাতা ॥

তাপস, রত্না, অভয়, পূবালী ও শৌভিক বসু/অটলবিহারী বসু লেন, কল-১১ ; লক্ষ্মীশ্রী, শিবব্রত, রাঙারানী ও নির্মল কুমার লাই/লেকটাউন, কল-৮৯ ; দেবস্মিতা সাহা/বাগমারী লেন, কল-৫৪ ; জয়তী, সুমন্ত ও জয়ন্ত মিত্র/শরৎ চ্যাটার্জী রোড, কল-৮৯ ; বুকাই, মিতুন, তাপস, বুম্বা, শিখা, অমিয় ; চুনী, পম্পা ও বাপ্পা/আগরপাড়া, কল-৫৮ ; দীধিতি মুখার্জী/গোরাচাঁদ রোড, কল-১৪ ; চন্দ্রাণী, বৈশাখী ও অমলেন্দু ঘোষ দস্তিদার/বিবেকানন্দ পল্লী, বেহালা, কল-৬০ ; সজল, মোম ও সুনয়ন/পি. জি. এইচ শাহ রোড, যাদবপুর, কল-৩২ ; মৌটুসী, বাপ্টি, মীনা, দাদাভাই ও তপনজ্যোতি ভৌমিক/তেঘরিয়া, কল-৫৯ ; শর্মিতা বেরা/ধীরেন ধর সরণি, কল-১২ ; চন্দনা গোস্বামী, প্রীতিকণা ও অমরেন্দ্র চম্পাটী/গল্ফগ্রীন, কল-৯৫ ; বিপ্লব, ব্রতীন, শ্যামলী, সুশীল ও অলকা চক্রবর্তী/দুর্গানগর, কল-৭৯ ; মলি ও বৈশাখী ঘোষ/দেশবন্ধুনগর, কল-৫৯ ; জিৎ, মুনিয়া, বাবলু ও জয়/হিন্দুস্থান পার্ক, কল-২৯ ;

॥ হাওড়া ॥

সৌম, সৌরভ ও সোনালি ব্যানার্জী/বি. বি. হালদার লেন, শিবপুর ; বুম্বা ও ডোরা মুখার্জী/বি. বি. হালদার লেন, শিবপুর ; অমিতাভ, অরুণাভ ও অরিন্দম ঘোষ/সদর বক্সী লেন ; মীরা, বিমান, রীতা, সব্যসাচী ও শতাব্দী মুখার্জী/গণেশ চ্যাটার্জী লেন, শিবপুর ; দেবাশিস সরকার/প্রসন্ন দত্ত লেন ;

॥ হুগলী ॥

সুনীতি, ঈশান, সুরঞ্জনা ও অশোক মুখার্জী/এস. পি. মুখার্জী সরণি, শ্রীরামপুর ; সায়ন দাস/হরিমোহন গোস্বামী স্ট্রিট, শ্রীরামপুর ; অস্মিত, দিগন্ত ও কাজলী চক্রবর্তী/শিরীষতলা, শ্রীরামপুর ; অরিন্দম নাথ, সায়ন ও স্বাতী সাহা/জমিদার বাগান, শেওড়াফুলি ; দেবাশিস, স্নেহাশিস ও দিয়া চ্যাটার্জী/এল. এম. ভট্টাচার্য স্ট্রিট, শ্রীরামপুর ; পার্থ, জয়ন্ত ও সায়ন ভট্টাচার্য/নবগ্রাম ;

॥ বর্ধমান ॥

অনুমিতা সরকার/জিলাপী বাগান ; সার্টে ও দান্তে/ধর্মপল্লী, আসানসোল ; সুমেধা, সুশ্বেতা, দেবশ্রুতি ও ঋতুপর্ণ/বার্নপুর ; পবিত্র ও বিউটি মুখার্জী/পূর্ব কলেজপাড়া, রানিগঞ্জ ; শিউ ও শবরী রায়/তিরাট কোলিয়ারী কোয়ার্টার্স, কালীপাহাড়ী ; অভীক ও অন্তরা বাউরী/শান্তিপথ, সি জোন, দুর্গাপুর ; অভিজিৎ চ্যাটার্জী/জামুরিয়া, শিবপুর ; কল্যাণী ও কিশোর দত্ত/ফরিদপুর, দুর্গাপুর ; রানাপ্রতাপ ও রুদ্রপ্রতাপ চক্রবর্তী/কুলটি, নিউ কলোনি ; আশুতোষ, তন্দ্রা ও মধুমিতা মুখার্জী/এস. এন. বোস রোড, দুর্গাপুর ; মলয়, দোয়েল, পাপিয়া, চন্দনা ও তন্ময় রায়/কুলটি বাবুপাড়া ; ধীমান, বিজয়া, মৌমি ও রুদ্র মিশ্র এবং হুকুস তুম্বা আচারিয়া/কোক ওভেন কলোনি, দুর্গাপুর ; বনবীথি ও শঙ্খসাথী পাল/সুবোধ স্মৃতি রোড (সাউথ), কাটোয়া ; প্রণব, গীতা, সৌম্য সেনগুপ্ত ও চিত্রলেখা দাশগুপ্ত/বহালপাড়া, কুলটি ; চুমকি, মৌলি, বাণী ও মানি/সুবোধ স্মৃতি রোড (বাইপাস), কাটোয়া ; বাবাই, সুতপা, আলো ও সুদীপ্ত দাস/সার্কাস ময়দান, কাটোয়া ;

॥ মেদিনীপুর ॥

শান্তি, মুক্তি, ভক্তি, গায়ত্রী, শিউলি, রীতা, মৌলি, সৌরভ, শতাব্দী, শতদ্রু ও রিয়া দাস/দাঁতন ; পম্পি, গোপু, কুহু ও পুষ্পরেণু দত্ত/মহিষাদল ; সোনামা, বাবুসোনা, তৃপ্তি ও বিশ্বজিৎ কর/সুভাষপল্লী, খড়্গপুর ; চন্দন, বিক্রু, অঞ্জনা ও অর্চনা/সিলি পয়েন্ট ; পাপাই, টুয়া, দীপালি, আমজাদ, পম্পা ও কুশল মিত্র/মহিষাদল ; জুপিটার, দীপ্তেশ, সন্দীপা, মণিদীপা, দীপান্বিতা, গীতা, সরোজিনী, সঞ্জীব ও রাজীব জানা/শেরপুর বাইপাস, কাঁথি ; দেবলীনা দাশ, অভীক সাঁতরা, বুল্টি ও ছোটদা/শরৎপল্লী, ইন্দা ;

॥ মুর্শিদাবাদ ॥

অরুণ, সঙ্গীতা, দেবদ্যুতি ও দূর্বাদল দাস/এ. সি. রোড (পূর্ব), খাগড়া ; পিউ গুপ্ত/অরবিন্দ পল্লী, রঘুনাথগঞ্জ ; শুভঙ্কর চক্রবর্তী/আজিমগঞ্জ ; বিশ্বজিৎ মুখার্জী/বনবিহারী পাড়া, জঙ্গীপুর ; বাঁধন, মোনেম ও সোনিয়া খন্দকার/ওল্ড পুলিশ লাইন রোড, গোরাবাজার, বহরমপুর ;

॥ বাঁকুড়া ॥

সাময়জিৎ ও জহর বসু/রেলওয়ে কোয়ার্টার, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ; পম্পা, শম্পা ও রুম্পা দত্ত/কাঠজুড়িডাঙা, কেন্দুয়াডিহি ; রিমা ও সৈকত হাজারী/সারদাপল্লী, নতুনচটী ; ইন্দ্রনীল রায়/মেজিয়া স্কুলপাড়া ; অর্ণব, অতি ও স্মিতা মুখোপাধ্যায়/অর্কগ্রাম ; বলু ও লাবু/নাজিরবান্দ পাড় ; শীলু, মিলু ও তিলু/ভক্তারবাঁধ ; শ্রাবন্তী, হৈমন্তী, অর্ণব, দীপা ও বিশ্বদেব বটব্যাল/ভক্তারবাঁধ ; অনিন্দিতা, প্রীতিসুন্দর ও প্রেমসুন্দর বটব্যাল/ভক্তারবাঁধ ; শুভ্রাংশু, সুধাংশু, হিমাংশু, সিতাংশু, সৌমিত্র, সন্দীপ ও সুদীপ/মটুকবনী ; মুন্নি ও পাপুন/দোলতলা ; লোপামুদ্রা, ইন্দ্রনীল, নমিতা ও শিবসাধন মণ্ডল/শুভঙ্করপল্লী ;

॥ পুরুলিয়া ॥

টিডো, এষা, জলি, পলি ও গাবু/মুনসেফডাঙা ;

মাঘ সংখ্যার বাকি উত্তরদাতাদের নাম পরের সংখ্যায়ঃ

নববর্ষের ছড়া

শ্যামাপদ কর্মকার

ডুমডুমাডুম আওয়াজ শুনি
বছর শুরুর গান,
মন্দিরেতে ঘণ্টা বাজে
মসজিদে আজান।

ভোরের আলোর ছোঁয়া লেগে
আকাশ হলো রাঙা,
জল-হারানো নদীর বুকে
জাগছে নতুন ডাঙা।

পল্লীপথে শিমূল গাছে
রাঙা ফুলের মেলা,
দল বেঁধে সব শালিক-ফিঙের
কিচিরমিচির খেলা।

নতুন বছর আসছে, তাকে
নতুন মনে নেবো,
স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার
সোনালি ফুল দেবো।

ডুমডুমাডুম বাজনা বাজে
আসছে নতুন দিন,
আনন্দেতে আমরা নাচি
তাক্ ধিনা ধিন ধিন।

দুই বেড়ালে

সুবীর গুপ্ত

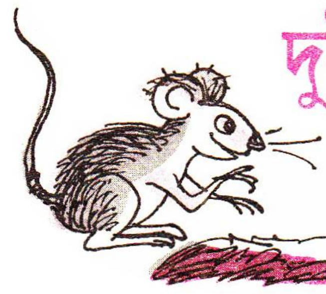

দেখতে পেলুম রান্নাঘরে
দুই বেড়ালে ঝগড়া করে
দুই বেড়ালের চক্ষু লাল
পরস্পরে দিচ্ছে গাল।

একটা বলে অন্যটাকে,
'ফেলবো তোকে বিষম পাকে'
আর একটা কম কিছু নয়
দাঁত খিঁচিয়ে দেখায় সে ভয়।

চোখ রাঙিয়ে একটা বলে,
'লড়বি নাকি? আয় না চলে,
দেবো তুলে এমন আছাড়
পৌঁছে যাবি সোজাই কাছাড়।'

কম যায় না অন্যটা ভাই
ফ্যাসফেঁসিয়ে বলে সেটাই,
'দেব এমন জবর ঠেলা—
দেখবি তারা দিনের বেলা।'

নেংটি ইঁদুর মুচকি হেসে
গোঁফ নাচিয়ে বললে শেষে,
'শিকেয় তোলা দুধের বাটি
কিসের তরে ঝগড়াঝাঁটি?'

কি বললে কি

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

সাজ বললেই পোশাক আসে,
লোক বললেই জন,
হাট বললেই বাজার বলি,
বাঘ বললেই বন।

সাঁঝ বললেই সকাল বলি,
মাঠ বললেই ঘাট,
মশা বললেই মশারি আর
গদি বললেই খাট।

রাত বললেই ঘুম এসে যায়,
ফুল বললেই কুঁড়ি,
রোগা বললেই মুখ শুকনো,
মোটা বললেই ভুঁড়ি।

ছবি : সুফি

মেধা ও বিত্ত

কিরণশঙ্কর মৈত্র

॥ এক ॥

একদিন মেধা ও বিত্তের মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হলো। দু'জনেই বলে আমি বড়। কিন্তু আসলে কে যে শ্রেষ্ঠ তার মীমাংসা আর কিছুতেই হয় না। তর্ক করতে করতে তারা এক নগরে এসে পৌঁছল। সেই নগরে ছিল বহু চোরের বাস। তাদের একজন খোদ রাজার ঘোড়াই চুরি করে বসেছিল। কেউ সেই ঘোড়া খুঁজে বার করতে পারল না। তখন রাজা নিজে ছদ্মবেশে বার হলেন হারানো ঘোড়ার খোঁজে।

রাত হয়ে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে শুরু হয়েছিল বৃষ্টি। রাজা এক তাঁতীর বাড়ির বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁতীর বউ বাইরে এসেছিল জল ফেলতে, অন্ধকার বারান্দায় একটা লোককে দেখে সে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, চোর চোর! আমাদের বারান্দায় একটা চোর লুকিয়ে আছে!

তাঁতী-বউয়ের চিৎকার শুনে লোকেরা লাঠি-সোঁটা নিয়ে দৌড়ে এসে অন্ধকারের মধ্যে রাজাকে পিটোতে শুরু করল। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে রাজা বললেন, আমি চোর নই, তোমাদের দেশের রাজা! শুনে সবাই হেসে উঠে বলল, রাজা কি এইরকম পোশাকে বাইরে যান নাকি? তিনি তো সিংহাসনে বসে থাকেন। এই বলে লোকেরা মারতে মারতে রাজার একটা ঠ্যাং ভেঙে দিল। তারপর তাঁকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বড় রাস্তার পাশে।

যন্ত্রণায় রাজা সেইখানে বসে যখন কাতরাচ্ছিলেন তখন সেখানে হাজির হলো মেধা ও বিত্ত। তারা তখনও পঞ্চমে গলা তুলে তর্ক করছে। রাস্তার পাশে একটা লোক ভাঙা ঠ্যাং নিয়ে ব্যথায় কাতরাচ্ছে দেখে তারা কাছে গিয়ে কারণ জিজ্ঞেস করল। রাজা সব ঘটনা তাদের বললেন।

তারা রাজাকে বলল, আপনি যখন রাজা তখন আমাদের তর্কের মীমাংসা করুন। বিচার করে বলুন কে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ?

রাজা বেচারির পায়ের যন্ত্রণায় প্রাণ যাচ্ছে! তাই কোনোরকম বিরোধের মধ্যে না গিয়ে তিনি বললেন, আমার মতে তোমরা দু'জনেই সমান সমান।

বিত্ত বললে, এটা কোনো মীমাংসাই নয়। তার চেয়ে বরং রাজার ভাঙা পা যে ভালো করে দিতে পারবে তাকেই শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করা হবে।

এই কথা বলে বিত্ত অনেক সোনা-দানা-রুপো এনে রাজার ভাঙা পায়ের উপরে রাখল। তাতে ভালো হবার বদলে রাজার পায়ের যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল।

এবার মেধার পালা। সে গিয়ে কাছের জঙ্গল থেকে বেছে বেছে লতা-পাতা, জড়িবুটি নিয়ে এল। সেগুলো থেঁতো করে তার প্রলেপ লাগাল রাজার ভাঙা পায়ে। তারপর দুটি সোজা কাঠ দিয়ে পা'টা বেঁধে দিল। ধীরে ধীরে রাজার পা অনেকটা ভালো হয়ে যন্ত্রণা কমে গেল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে পারলেন। মেধা বলল, আমি রাজার পা ভালো করে দিয়েছি, অতএব আমিই শ্রেষ্ঠ।

বিত্ত তার কথায় আমলই দিল না। বলল, একজন লোকের ভাঙা পা ভালো করার মধ্যে এমন কি কৃতিত্ব আছে? আমিই বড়।

তারা ফের তর্ক করতে করতে পথ চলতে লাগল। এবার তারা এক গরীব তাঁতীর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। তাঁতীর ভালো করে খাবার জুটত না। হাড়-জিরজিরে চেহারা। আশেপাশের গাছের ফলমূল খেয়ে সে কোনোরকমে বেঁচে আছে। তাকে দেখিয়ে বিত্ত বলল, এই ছেলেটির চেয়ে গরীব আর কে

আছে? কী দুর্দশাগ্রস্ত চেহারা দেখ! এর সঙ্গে আমি যদি রাজার মেয়ের বিয়ে দিতে পারি তাহলে তো তুমি স্বীকার করবে যে আমিই বড়?

মেধা সে কথা শুনে হেসে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়েই দেখাও!

সেই তাঁতী তার ছোট্ট এক টুকরো জমিতে ভুট্টা ফলিয়েছিল। বিত্ত প্রতিটি ভুট্টায় চারটি শিষ বানিয়ে সব সোনার করে দিল।

তাঁতী কিন্তু ছিল বেজায় বোকা। এক ব্যবসায়ী তার ভুট্টা কিনতে এলে সে চার-শিষওয়ালা সোনার ভুট্টাগুলো সব সাধারণ ভুট্টার দামে বেচে দিল। ব্যবসায়ী বাড়িতে গিয়ে দেখল তাঁতীর কাছে কেনা ভুট্টাগুলো সোনার। সে ভয় পেয়ে সেই ভুট্টা নিয়ে হাজির হলো রাজার কাছে। ব্যবসায়ীর মুখে সোনার ভুট্টা পাওয়ার কথা শুনে রাজা তাঁর পেয়াদা পাঠালেন তাঁতীকে ধরে আনতে। তাঁতী তো কাঁপতে কাঁপতে এল। রাজা বললেন, তোমার ক্ষেতের সব ভুট্টা আমাকে দিয়ে দাও। বিনিময়ে আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।

রাজাকে সব সোনার ভুট্টা দিয়ে রাজকুমারীকে বিয়ে করল তাঁতী। বিয়ের পর দু'জনে নগরেই রয়ে গেল। সেই গরীব তাঁতী যখনই কোনো দামী জিনিস দেখত, হাত নাড়িয়ে বলত, 'টুকরুস-টুকরুস', যেন সে সুতো দিয়ে কাপড় বুনছে। দেখে বিরক্ত হতো রাজকন্যা। একদিন সে তাঁতীকে বলল, দেখ, তুমি এখন রাজার জামাই, রাজসভায় গিয়ে তোমার আদব-কায়দা শেখা উচিত।

তাঁতী কী বলবে ভেবে পেল না। সে কি রাজসভার আদব-কায়দা জানে? সেখানে গিয়ে সে কী করবে?

তার হাবভাব দেখে রাজকন্যা আপন মনেই বলে উঠল, কাল যদি ও রাজসভায় না যায় তাহলে ওকে মেরে ফেলে স্বামী ছাড়াই আমি জীবন কাটাব।

মেধা তখন বিত্তকে বলল, তুমি তাঁতী বেচারাকে রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছ, কিন্তু তাতে কী ভালো হলো? এই হতভাগা তো শুধু 'টুকরুস টুকরুস' বলে শূন্যে মাকু চালায়। আর রাজকন্যার কথা তো শুনলে, কাল ঐ রাজার মেয়ের হাতেই তাঁতী মারা পড়বে।

বিত্ত বলল, ঠিক আছে। যে ওর জীবন বাঁচাতে পারবে আমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ।

তাঁতী বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। মেধা তার মনের মধ্যে অনেক জ্ঞান ও বুদ্ধি দিল। সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হলো তাঁতীর আচার-ব্যবহারে। পরের দিন সকালে স্নান করে মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে রাজসভায় রওনা হলো সে। তার রাজকুমারী স্ত্রী খুশি হয়ে ভাবল, আমার স্বামীর মাথায় শেষ পর্যন্ত কিছু বুদ্ধি হয়েছে।

তাঁতী রোজ রাজসভায় গিয়ে বসে থেকে দেখে-শুনে রাজ্যশাসন বিষয়ে অনেক কিছু জেনে গেল। রাজা তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করলেন। এইভাবে অনেক বছর কেটে গেল। কিন্তু বিত্ত ও মেধার ঝগড়া শেষ হয়নি।

বিত্ত বলল, তুমি গরীব তাঁতীকে মন্ত্রী বানিয়ে তার জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছ। স্ত্রী এবং ছেলেপুলে নিয়ে সে এখন সুখে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু ওকে যদি আমি মন্ত্রীপদ থেকে বরখাস্ত করে দিতে পারি তাহলে আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হবে?

মেধা বলল, তাহলে তোমাকেই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করব।

বিত্ত নগরের এক ধূর্ত ব্রাহ্মণকে অনেক সোনা-রুপো দিয়ে তাকে রাজার কাছে পাঠাল তাঁতীকে বিপদে ফেলবার জন্যে। সেই ব্রাহ্মণ গিয়ে রাজাকে বলল, মহারাজ, আপনি একজন বিখ্যাত হিন্দুরাজা হয়েও কিনা এক তাঁতীর সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে

তারপর পা'টা বেঁধে দিল।

ধূর্ত ব্রাহ্মণকে অনেক সোনা-রুপো দিয়ে আমাদের বলবার কিছু নেই। কিন্তু মহারাজ, তাঁতীকে মন্ত্রী বানাবার জন্যে সবাই আপনার পিছনে হাসছে। আপনি ওকে মন্ত্রীপদ থেকে হটিয়ে অন্য কাউকে মন্ত্রী বানান।

রাজা বললেন, আমি ওকে মন্ত্রীপদ থেকে কি করে হটাব? ও নিজের কাজ খুব ভালোভাবে করে।

ব্রাহ্মণ বলল, আচ্ছা, ও যদি এতই বুদ্ধিমান এবং নিজের কাজকর্ম ভালোভাবে করে তাহলে ওকে বলুন মাকড়সার জাল দিয়ে আপনার জন্যে একটি কাপড় বানিয়ে আনতে। বলুন, সেই কাপড় পরে আপনি মন্দিরে পুজো দিতে যাবেন। এক মাসের মধ্যে এই কাপড় বুনে না আনতে পারলে ওকে মৃত্যুদণ্ড দিন।

রাজা ব্রাহ্মণের কথা শুনলেন। পরের দিন তাঁতী-মন্ত্রী রাজসভায় এলে তাকে তিনি এক মাসের মধ্যে মাকড়সার জালে বোনা কাপড় আনতে আদেশ দিলেন, না পারলে তার মৃত্যুদণ্ড।

।। দুই ।।

হতভাগ্য তাঁতী বাড়িতে এসে স্ত্রী এবং পুত্রদের রাজাদেশের কথা জানাল। শুনে তারা সবাই ভয় পেয়ে দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে লাগল। তাঁতীর সবচেয়ে ছোট ছেলে ভাবল, এরা যদি সবাই মারা যায়, এদের সঙ্গে আমিও মারা যাব। আমি বরং পালিয়ে যাই।

এই কথা ভেবে কিছু খাবার নিয়ে অন্য এক নগরে সে পালিয়ে গেল। ভাগ্যক্রমে সেখানকার এক মহাজনের বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে গেল সে। মহাজনের ছিল একটি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। তার নাম চম্পা।

মহাজনের অনেক জমি-জমা। ষাটটি হাল যুতত তার ক্ষেতে। তাঁতীর ছেলে তাদের সঙ্গে মাঠে যেতে শুরু করল। যাবার পথে যখন কোনো ছোট নদী-নালা পড়ত, সে পায়ে জুতো পরে নিত, কিন্তু শুকনো জায়গায় সে হাঁটত জুতো খুলে।

একদিন মাঠে মহাজন জন-মজুরদের বীজ-বোনার কাজ দেখাশুনা করছিল। তাঁতীর ছেলে এসে জিজ্ঞেস করল, এত বড় মাঠ যখন ফসলে ভরে যাবে তখন সেই ফসল রাখতে কতকগুলি পাত্র দরকার হবে?

মহাজন তার প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারল না। কিন্তু তাঁতীর ছেলে বারবার প্রশ্ন করায় সে রেগে বাড়ি চলে গেল। বাড়ি ফিরলে মেয়ে তাকে খেতে দিয়ে রান্নাঘরে গেছে, মহাজন তখন একাই হাসতে শুরু করে দিল। মেয়ে চম্পা বাবার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, তুমি একা-একা হাসছ কেন?

মহাজন তার প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। চম্পা তখন তার সামনে থেকে খাবারের থালা সরিয়ে নিয়ে বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার হাসির কারণ না বলবে ততক্ষণ খেতে পাবে না।

মহাজন তখন তাঁতীর ছেলের কথা উল্লেখ করে বলল যে ওর হাবভাব ও কথাবার্তার কথা মনে পড়ায় সে হাসছিল।

চম্পা বলল, তুমি সেই লোকটিকে এখানে নিয়ে এসো। তারপর খেতে পাবে।

মহাজন তখন তাঁতীর ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে আসে। চম্পা তাদের দু'জনকে খেতে দেয়। কথাবার্তা বলে চম্পা বুঝতে পারে তাঁতীর ছেলে বুদ্ধিমান।

তাঁতীর ছেলে ছিল স্বল্পাহারী। খেয়ে-দেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

চম্পা তখন তার বাবাকে তাঁতীর ছেলের অদ্ভুত ব্যবহারের কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়, ওর জলের ভিতর দিয়ে যাবার সময়ে জুতো পরার কারণ জলের ভিতরে কি আছে তা সে জানে না। তাই সাবধান হয়ে জুতো পরে যায়। কিন্তু উপরে শুকনো জায়গা দিয়ে যাবার সময়ে খুলে নেয়, কারণ মাটির উপরে সে দেখতে পাচ্ছে সেখানে কী আছে। ফসল রাখতে কতকগুলি পাত্র লাগবে জানতে চাইবার কারণ, ফসল ঘরে তুলবার আগেই সেজন্যে সব ব্যবস্থা করে রাখা উচিত যাতে ফসলের অপচয় না হয়। প্রত্যেক বছরই অকারণে আমাদের অনেক

ফসল কি নষ্ট হয় না?

মেয়ের কথা শুনে মহাজন বুঝতে পারল তাঁতীর ছেলে সত্যিই বুদ্ধিমান। তাই তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিল সে।

বিয়ের পরে তাঁতীর ছেলের বাড়ির কথা খুব মনে পড়ে যায়—না জানি সেখানে তাদের ভাগ্যে কী ঘটছে! স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়বার পরেও তার চোখে ঘুম আসে না, বরং দু'চোখ থেকে অবিরল ধারায় জল গড়িয়ে পড়ে মাথার বালিশ ভিজিয়ে দেয়। সকালে উঠে চম্পা দেখে যে তার স্বামীর মাথার বালিশ ভেজা। সে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার? তাঁতীর ছেলে তখন তার বাড়ির সব কথা এবং রাজ্যদেশের কথা খুলে বলে। সব শুনে চম্পা বলে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। চলো, আমরা তোমাদের বাড়িতে যাই। সেখানে গিয়ে সবাইকে বাঁচাতে হবে।

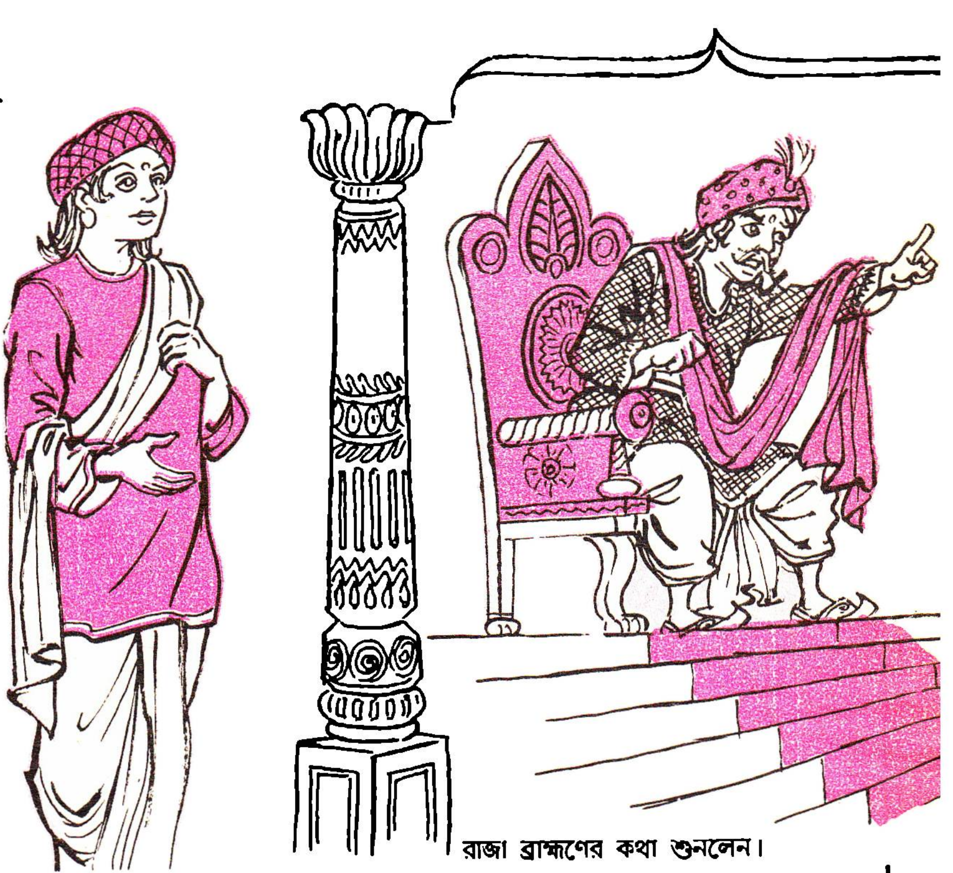

রাজা ব্রাহ্মণের কথা শুনলেন।

বৌকে নিয়ে বাড়ি ফিরে সে দেখে সেখানকার অবস্থা খুবই শোচনীয়। তার বাবা রাজসভায় যাওয়া বন্ধ করেছে। খাওয়া-দাওয়ায় রুচি নেই, খুবই অসুস্থ। চম্পা শ্বশুরকে সান্ত্বনা এবং সাহস দিয়ে বলল, আপনার কোনো ভয় নেই, বাবা। ভগবানের আশীর্বাদে সব বিপদ দূর হয়ে যাবে। আপনি খাওয়া-দাওয়া করুন। আমি আপনার সঙ্গে রাজসভায় যাব। রাজাকে আমি দিয়ে আসব তাঁর শখের মাকড়সার জালে-বোনা পোশাক।

পুত্রবধূ চম্পাকে দেখে ও তার কথাবার্তা শুনে মন্ত্রী মনে অনেক বল ও ভরসা পেল। পরের দিন খেয়ে-দেয়ে পোশাক-পরিচ্ছদ পরে সে রাজসভায় চলল, পেছনে পেছনে তার পুত্রবধূ চম্পা। তার মাথায় একটি নতুন মাটির হাঁড়ি। রাজসভায় গিয়ে রাজাকে প্রণাম করে চম্পা বলল, মহারাজ, আপনি আমার শ্বশুরকে মাকড়সার জাল দিয়ে কাপড় বুনে নিয়ে আসতে বলেছেন। কিন্তু ঐ ধরনের কাপড় তো আর মুখের কথায় বানানো যায় না, তার জন্যে অনেক নিয়ম-কানুন আছে। তাই আমি এই নতুন মাটির হাঁড়িটি নিয়ে এসেছি। মহারাজ, আপনি ফুঁ দিয়ে দিয়ে এই হাঁড়িটি হাওয়ায় ভরে দিন। হাঁড়িটি পূর্ণ হলে শুভক্ষণে কাজ শুরু হবে। তারপরে আমরা অনায়াসেই আপনার জন্যে বুনে দেব মাকড়সার জাল দিয়ে অতি সুন্দর কাপড়।

চম্পার কথা শুনে রাজার পিলে চমকে গেছে। তিনি বললেন, আমার মুখের হাওয়া দিয়ে কিভাবে এই মাটির হাঁড়ি ভরব? তা কি কেউ পারে?

তাহলে মহারাজ, ভেবে দেখুন, মাকড়সার জাল দিয়ে কি কেউ কাপড় বুনতে পারে? তা কি সম্ভব? চম্পা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

রাজা তখন মন্ত্রীকে বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, মন্ত্রী, আমি আমার মত বদলে ফেলেছি। তোমাকে আর মাকড়সার জাল দিয়ে কাপড় বুনতে হবে না। তোমাকে আমি আবার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করলাম। আগের মতো তুমি রাজসভায় আসতে শুরু করো।

মন্ত্রী ও চম্পা রাজসভা থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল। কিন্তু তারপরেই আবার সেই ধূর্ত ব্রাহ্মণ এসে হাজির। রাজার কাছে সব কথা শুনে সে বলল, ঠিক আছে, মন্ত্রী প্রথম চালে জিতে গেছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কাল রাজসভায় এলে ওকে আপনি আড়াই সের মশার হাড় আনতে আদেশ দিন। এই কথা বলে ব্রাহ্মণ বিত্তের দেওয়া অনেক ধনরত্ন রাজাকে উপহার দিয়ে চলে গেল।

পরের দিন মন্ত্রী রাজসভায় এলে রাজা তাকে আড়াই সের মশার হাড় আনতে আদেশ দিলেন। এক মাসের মধ্যে এই মশার হাড় আনতে না পারলে তার প্রাণদণ্ড।

মন্ত্রী বাড়ি ফিরে আবার নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিল। চম্পা সবকিছু শুনে বলল, চিন্তার কোনো কারণ নেই। একবার আপনাকে আমি বাঁচিয়েছি, এবারেও ভগবানের আশীর্বাদে বাঁচাব।

শ্বশুরকে ভালোভাবে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল সে। পরের দিন একটি বেতের ঝুড়িতে কিছু ধান ভালোভাবে কাপড় দিয়ে ঢেকে নিয়ে সে আবার শ্বশুরের পেছনে পেছনে রাজসভায় চলল।

রাজসভায় গিয়ে রাজাকে প্রণাম জানিয়ে সে বলল, মহারাজ, আমরা

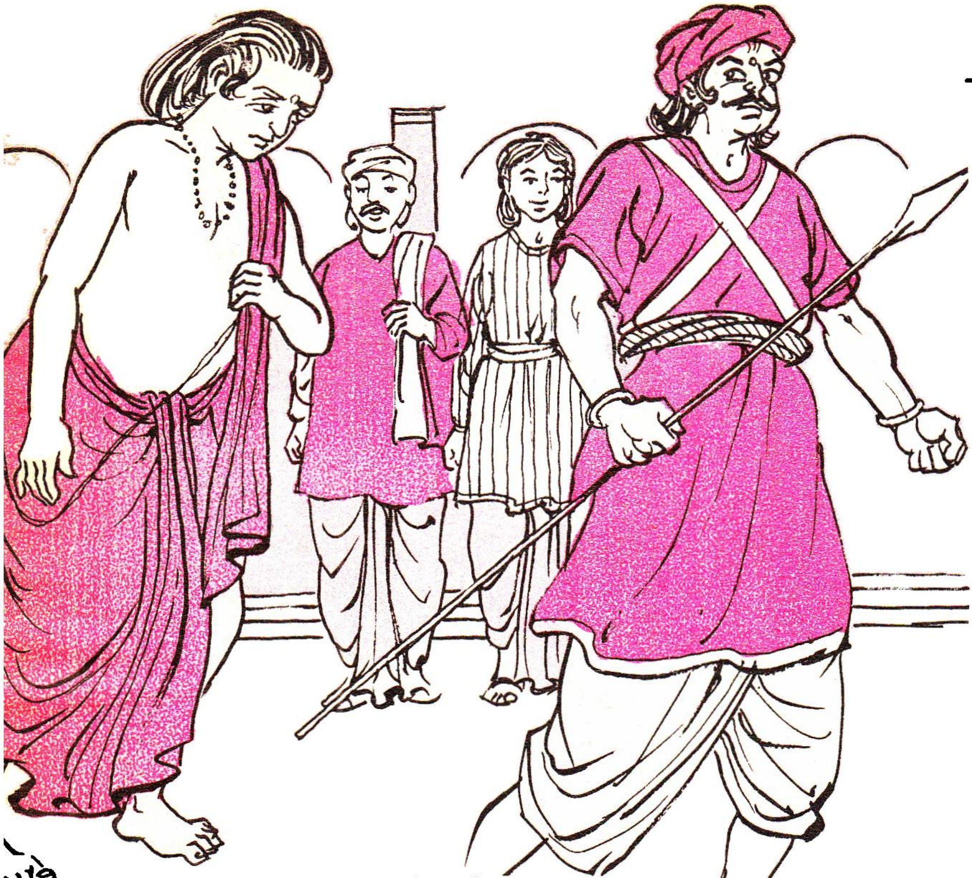

তাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

আড়াই সের মশার হাড় নিয়ে এসেছি। কিন্তু জিনিসটি আপনাকে দেবার আগে আপনার সামনেই আবার ওজন করা দরকার। এর জন্যে চাই বিশেষভাবে তৈরি দাঁড়িপাল্লা যার দণ্ড বানানো হয়েছে হাওয়া দিয়ে আর পাল্লা দুটি উত্তাপ দিয়ে।

রাজা অবাক হয়ে বলেন, এমন দাঁড়িপাল্লা কোথাও কি পাওয়া সম্ভব?

সঙ্গে সঙ্গে চম্পা জবাব দিল, মহারাজ, মশার হাড় যোগাড় করে আনা কি সম্ভব?

রাজা বললেন, মন্ত্রী, তোমাকে যা বলেছিলাম তা আর তোমাকে আনতে হবে না। তুমি আগের মতোই রাজসভায় এসো।

চম্পা শ্বশুরকে নিয়ে হাসিমুখে ঘরে ফিরে এল।

ওদিকে ব্রাহ্মণ এসে রাজার কাছে সব শুনে বলল, মন্ত্রীর পুত্রবধূ খুবই বুদ্ধিমতী। আচ্ছা, এবার মন্ত্রীকে আপনি তার বাড়িতে একটি কুয়ো খুঁড়তে বলুন। তারপর সেই কুয়োটিকে বলুন বাজারের মধ্যে নিয়ে বসাতে যাতে লোকজন কুয়োর জল নিয়ে খেতে পারে।

রাজাকে অনেক টাকাপয়সা দিয়ে ব্রাহ্মণ চলে গেল।

পরের দিন মন্ত্রী রাজসভায় এলে রাজা তাকে ব্রাহ্মণের কথামতো বাড়িতে কুয়ো খুঁড়ে সেটি বাজারের মধ্যে নিয়ে বসাতে আদেশ দিলেন। এক মাসের মধ্যে এই কাজ করতে না পারলে তার প্রাণ যাবে।

মন্ত্রী বিষণ্ণ মনে ঘরে এসে সব কথা জানাল। চম্পা সব শুনে বলল, এটা তো কিছুই নয়। চিন্তা করবেন না। রাজার কুয়োর ব্যবস্থা আমি করছি।

পুত্রবধূ অভয় দিলেও মন্ত্রীর ভয় গেল না। সে লোকজন লাগিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে উঠোনের মাঝখানে একটা কুয়ো খুঁড়ে ফেলল। পরের দিন গায়ে কাদা মেখে এবং হাতে একটা দড়ি নিয়ে শ্বশুরের পেছনে পেছনে চম্পা রাজসভায় চলল। তার অবস্থা দেখে রাজা কারণ জানতে চাইলে চম্পা উত্তর দিল, মহারাজ, আমাদের উঠোনের মাঝখানে কুয়ো খুঁড়ে এই দড়ি দিয়ে সেটিকে বেঁধে বাজারের মধ্যে বসাতে চাইছিলাম। কিন্তু কুয়োটা খুবই ভারী। আমাদের পক্ষে সেটিকে তুলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আপনার উদ্যানের মধ্যে যে কুয়ো আছে সেটাকে একটু সাহায্য করতে বলুন। এই দড়ির এক প্রান্ত আপনার বাগানের কুয়োর গলায় বেঁধে দেব, অন্য প্রান্ত আমাদের কুয়োর গলায়। আপনার বাগানের বড় কুয়োটা আমাদের কুয়োটাকে নিশ্চয়ই বাজারের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে পারবে।

রাজা চম্পার কথা শুনে হতচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু আমার বাগানের কুয়োটাকে কিভাবে তোমাদের বাড়িতে পাঠাব? তাই কি সম্ভব?

তাহলে আমরা কিভাবে আমাদের কুয়োকে মাটি থেকে তুলে বাজারে নিয়ে বসাব? সেটাও কি সম্ভব? চম্পা উত্তর দেয়।

রাজা তখন হেসে বলেন, এবারেও তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়েছ। মন্ত্রী, তোমাকে আর এই ধরনের কোনো কাজ করতে হবে না। যাও, বাড়িতে গিয়ে শান্তিতে ঘুমোও। কালকে রাজসভায় এসে আগের মতো কাজকর্ম কোরো।

এরপর আবার সেই ব্রাহ্মণ যখন এল, রাজা তাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, তোমার বন্ধু বিত্তের অনেক ধনরত্ন থাকতে পারে, কিন্তু ঐ মেয়েটির বুদ্ধি অনেক বেশি। বুদ্ধির জোরে বিত্তবানদেরও হারিয়ে দেওয়া যায়।

এই কথা বলে রাজা সেই ব্রাহ্মণের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

ওদিকে অনেকদিন পরে আবার বিত্তের সঙ্গে মেধার দেখা। মেধা জিজ্ঞেস করল, কে শ্রেষ্ঠ?

বিষণ্ণ কণ্ঠে বিত্ত উত্তর দেয়, তুমি, তোমার বুদ্ধি।

• ভারতের বস্তার অঞ্চলের মুরিয়া উপজাতিদের গল্প অবলম্বনে।

ছবিঃ দিলীপ দাস

কালু দলুই বলল, এই যে আজকাল রাস্তায় রাস্তায় রোলের দোকান-গুলো দেখেন না, ওগুলো আমার জন্যই চালু হয়। সে একখানা গল্প।

কালুদা নবরাম মহাবিদ্যালয়ের নাইট-গার্ড। বয়েস পঞ্চাশ হবে। মোটাসোটা। তকতকে করে কামানো মুখ। চোখে প্লাস্টিক ফ্রেমের চশমা। কালুদার রাতে ডিউটি। তাই একমাত্র মাইনের চেক নেওয়ার দিন ছাড়া তাকে বড় একটা দেখা যায় না।

আজ কলেজে মাইনের চেক দেওয়া হচ্ছে। তার ওপর মেয়ে স্টার নিয়ে মাধ্যমিক পাশ করায় ইংরেজির

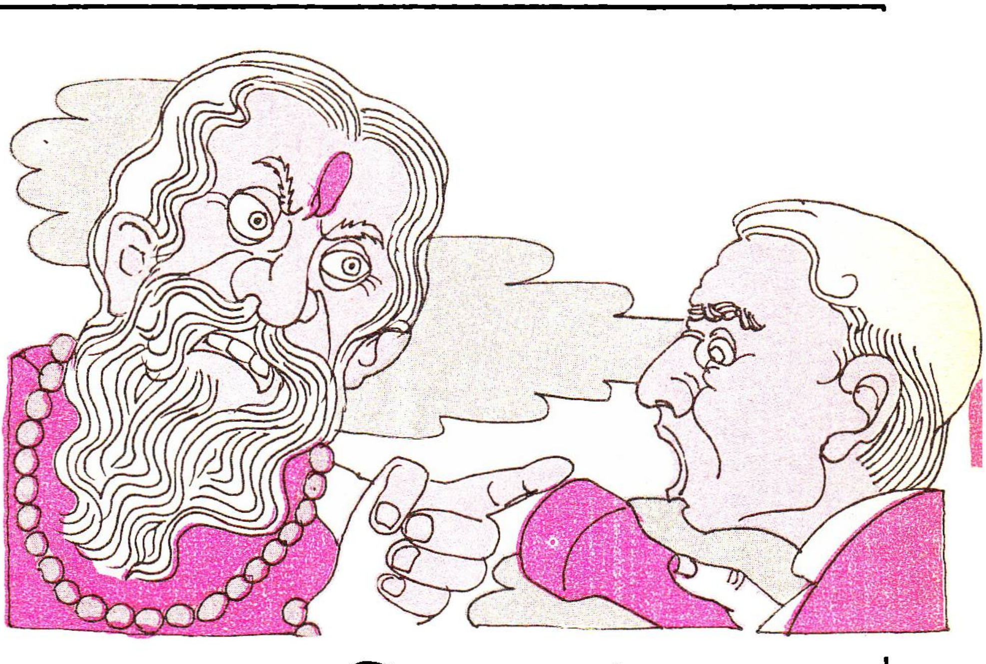

গোপালের পাটিসাপটা

শুভমানস ঘোষ

মাস্টারমশাই অধ্যাপক উপলবাবু এক কথায় একটা পাঁচশ টাকার নোট বের করে দিয়েছেন।

কলেজের উল্টোদিকে এ তল্লাটের নামকরা দোকান পিসিমার রেস্টুরেন্ট। সেখানে তিরিশ পিস মাটন, দশ পিস এগ আর পনেরো পিস ফিশরোলের অর্ডার দিয়ে এসে কালুদা গল্প শুরু করল। নাইট-গার্ড হলে কী হবে, কালুদা গল্প বলতে জানে।

কালুদা বলল, সে বিশ-বাইশ বছর আগের কথা। তখন কলেজ এতবড় হয়নি। একটাই বিল্ডিং। নিচে পর পর ক্লাসরুম। ওপরে স্টাফরুম, অফিস আর লাইব্রেরি-ঘর, ব্যস। এখন যেখানে সায়েন্স বিল্ডিং সে জায়গাটা তখন জঙ্গল একরকম। দিনের বেলাতেও সেখানে শিয়াল ডাকত। সাপখোপও ছিল বিস্তর। লোকে বলত, ওখানে আগে নাকি কবরখানা ছিল। আমরা অবিশ্যি কবর দেখিনি, বুড়োঠাকুরের বেদিটা দেখেছি। সেখানে বসে অমাবস্যার রাতে বুড়োঠাকুর ভূত নামাতেন। তাই রাতে দূরের কথা, দিনের বেলাতেও সেখানে পা বাড়াতে আমাদের গা ছমছম করত।

বুড়োঠাকুরটি আবার কে? ক্যাশিয়ার মদন জিজ্ঞেস করল।

উত্তরটা দিলেন কলেজের হেডক্লার্ক অমলবাবু, যাঁর নামে আমাদের কলেজ —নবরাম দাস, তাঁকেই বুড়োঠাকুর বলা হতো। পঁচাত্তর সালে মারা যান। তান্ত্রিক হিসেবে বুড়োঠাকুরের নামডাক ছিল। সায়েন্স বিল্ডিংয়ের কোণে এখন যেখানে চিপ-স্টোর সেখানেই আশেপাশে কোথাও তাঁর সৎকার হয়।

কালুদাও গল্পে ভূত-টুত নামাবে না কি? মদন নড়েচড়ে উঠল।

কালুদা মুচকি হেসে হ্যাঁও হয় নাও হয় গোছের ঘাড় নেড়ে আবার শুরু করল, তখন আমার কাঁচা বয়েস। কলেজ পাহারার নামে সারারাত নাক ডাকাই আর সকাল হলেই চিপ-ক্যান্টিনের দরজা খুলে বসে পড়ি। টানা বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ম্যাজিকের মতন টোস্ট, ঘুগনি, অমলেট আর আলুর দমের বন্যা বইয়ে দিই। পকেটে বেশ দু'পয়সা আসছিল, কিন্তু একদিন গেল ম্যাজিক ফাঁস হয়ে।

সেদিন বেজায় শীত পড়েছে। আমি সিঁড়ির নিচে মশারি খাটিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে তোফা রাত-পাহারা দিচ্ছিলাম। আচমকা কার বাজখাঁই গলার আওয়াজে আমার ঘুম গেল ভেঙে। তাড়াতাড়ি বালিশের তলা থেকে টর্চটা বের করে জ্বালিয়েছি কি বুক হিম। বুড়োঠাকুর খোদ। কপালে দগদগ করছে সিঁদুর। হাতে ত্রিশূল, কাঁধে ঝোলা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে রক্তাম্বর।

হতভাগা এই তোর নাইট ডিউটি? বুড়োঠাকুর ত্রিশূল উঁচিয়ে গর্জন ছাড়লেন।

আমি মশারি ছিটকে বাইরে বেরিয়ে সোজা পড়ে গেলাম বুড়োঠাকুরের পায়ে, অন্যায় হয়েছে ঠাকুর। আর কখনও এমন হবে না। এই নাক মুলছি, কান মুলছি।

ঠিক বলছিস? আর ঘুমোবি কোনওদিন?

না ঠাকুর।

বুড়োঠাকুর বললেন, কথাটা মনে রাখিস। যদি এর অন্যথা হয় তবে তোর কপালে দুঃখ আছে জানবি। আজই আমি

গোপালকে বলে দিচ্ছি। এখন থেকে তুই কলেজ পাহারা দিবি, আর গোপাল পাহারা দেবে তোকে। গোপাল কিন্তু বড় সোজা ছেলে নয়। খুব সাবধান।

বুড়োঠাকুর ঠাণ্ডা হয়েছেন দেখে ফস করে জিজ্ঞেস করে বসলাম, গোপাল কে ঠাকুর?

উত্তরে বুড়োঠাকুর যা বললেন, শুনে তো আমি তাজ্জব। গোপাল হলো বুড়োঠাকুরের পোষা ভূত। গোপাল যখন বেঁচে ছিল তখন সে ছিল পুলিশের চর। মরে গিয়েও এখনও সে অভ্যেসটা ছাড়তে পারেনি।

মদন উঠে পড়ল, যা ভেবেছি তাই। যত্ত ভুতুড়ে গালগল্প।

টাইপিস্ট সুকান্ত হাত তুলল, আরে চললি কই? পিসিমার রোল এল বলে।

বলছিস? তা হলে বসেই যাই। গালগল্প শুনে খিদেটা বাড়িয়ে নিই এখন। তারপর?

কালুদা পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করে বার কয়েক টকাস টকাস করে শুরু করল, বুড়োঠাকুরের হুকুম বলে কথা। পরের রাত থেকে মন দিয়ে পাহারা দিতে আরম্ভ করলাম। বিছানা-বালিশ-লেপ-মশারি সব বাদ দিয়ে একটা বাঁদুরে টুপি, গামবুট আর এক পিস হুইশেল কিনে অ্যায়সা পাহারা দিতে আরম্ভ করলাম সকালে ক্যান্টিনের ঘুগনির গামলায় মুখ গুঁজে পড়ি আর কী। সাত দিন গেল না, আমার উসকোখুসকো চুল, লাল লাল চোখ, পাগল পাগল দশা। দশ দিনের দিন সত্যি সত্যি ক্ষেপে গেলাম। আমার এক দেশোয়ালি ভাই নগাকে ধরে পড়লাম, ভাই রে আমায় বাঁচা।

নগা তখন কামকাজ খুঁজতে সবে গ্রাম থেকে এখানে এসেছে। ঠিক হলো ওকে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেব, ও আমার হয়ে রাতে কলেজ পাহারা দিয়ে দেবে। শুনে নগা তো হাতে চাঁদ পেল। পরের রাত থেকেই নেমে পড়ল কাজে। তবে ওকে শিখিয়ে দিলাম, রাতে যদি কোনওদিন বুড়োঠাকুরের মুখোমুখি হয়

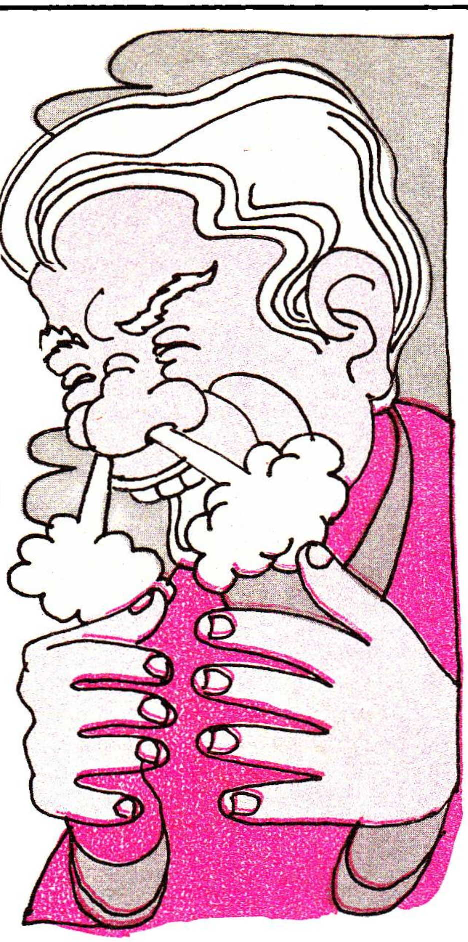

তখন যেন বলে, আমার শরীর খারাপ বলে রাতটা সে আমার হয়ে পাহারা দিয়ে দিচ্ছে। সেই সঙ্গে তাকে পইপই করে বলে দিলাম, বিছানা-টিছানা নিয়ে যাওয়া দূরের কথা, ভুলেও যেন রাতে দু'চোখের পাতা এক না করে। বেচারা গাঁয়ের ছেলে, পাছে ভিরমি যায়, তাই ইচ্ছে করেই তার কাছে গোপালের কথাটা ফাঁস করলাম না। নগা তখন মাস গেলে পঞ্চাশ টাকার আনন্দে লাফাচ্ছে। ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু সাতটা রাত কাটল না, ঘটে গেল কাণ্ডটা।

কালুদা থামল। ডিবেটা খুলে এক চিমটে নস্যি তুলে তক্ষুণি নাকে না গুঁজে দু'আঙুলের ফাঁকে রেখে আবার গল্পে ফিরে গেল, সেদিন কাকভোরে যেমন কলেজে যাই গিয়ে দেখি নগা বেপাত্তা। নগা নগা করে গলা ভেঙে ফেললাম, কিন্তু কোথায় নগা। এইবার আমার কেমন ভয় ভয় হলো। পা টিপে টিপে বারান্দায় উঠে সিঁড়ির কাছে গিয়ে তো আমার মাথায় হাত। নগাকে যেটা বারণ করেছিলাম ঠিক সেটাই করে বসে আছে। সিঁড়ির নিচে মশারি-টশারি দিয়ে সুন্দর করে বিছানা সাজানো। কিন্তু ভেতরে শুধু পড়ে আছে বালিশটা। আমার বুকখানা ধড়াস করে উঠল। সর্বনাশ, গোপালভূত নগাকে অদৃশ্য করে দিল না তো? এই ভেবে এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ আমার চোখে পড়ল কলেজ মাঠের একধারে সাদা মতন কী একটা দেখা যাচ্ছে। দিলাম ছুট। ছুটতে ছুটতে কাছে গিয়ে একদম হাঁ হয়ে গেলাম। দেখি কি, নগা পুরো এগরোল হয়ে মাঠে শুয়ে মজাসে নাক ডাকাচ্ছে। গোপালভূতকে ভাল বলতে হবে, প্রাণে মারেনি নগাকে, কেবল তাকে লেপসুদ্ধু পাকিয়ে এনে মাঠে ফেলে দিয়ে গেছে।

কালুদা নাকে নস্যি গুঁজে বলল, নগাকে ওই অবস্থায় দেখে ফস করে আমার মাথায় রোলের আইডিয়াটা এসে গেল। আমার মনে হলো, আরে বাস, এটা তো বেশ জিনিস। চালিয়ে দিলে কেমন হয়। ভাবা কি, পরের দিন থেকেই ক্যান্টিনে চালু করে দিলাম একটা নতুন আইটেম, গোপালের পাটিসাপটা।

পাটিসাপটা? মদন বিষম খেল।

কালুদার মুখে হাসি ফুটল, রোল মানে তো আসলে পাটিসাপটাই। ঠিক কি না? ছেলেরা তো গোপালের পাটিসাপটাকে একেবারে লুফে নিল। তাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে পিসিমার রেস্টুরেন্টের পিসিমা এটাকে রোল নাম দিয়ে বাজারে চালু করে দিল। দেখতে দেখতে রোল জিনিসটা দিব্যি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

হ্যাঁচ্চো!

নাকে নস্যি দিল কালুদা, হেঁচে মরল ক্যাশিয়ার মদন।

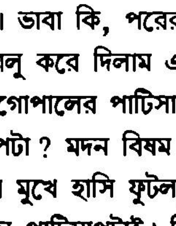

ছবি : রঞ্জন দত্ত

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং শ্যামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

কোনও গল্প নেই,
নিখুঁত তথ্যসমৃদ্ধ রচনা
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের

'বইব্যবসা ও পাঁচপুরুষের বাঙালী পরিবার'

১৮৬০ সালে বরদাপ্রসাদ মজুমদার পাতিহাল থেকে কোলকাতা এলেন। জমিদারি ছেড়ে শুরু করলেন বইফেরি। তাঁর শুরু করা সেই ব্যবসা পাঁচ পুরুষের হাত ধরে নতুন শতাব্দীতে পঞ্চদশ দশকে প্রবেশ করল। কিভাবে, কতটা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, দেশে-বিদেশে দুর্লভ এরকম একটি প্রতিষ্ঠান দেড়শ বছরের দিকে এগিয়ে চলেছে? নির্ভীক, নির্মোহ লেখনীতে অবিচ্ছিন্ন সেই ধারাবাহিকতার সম্পূর্ণ দলিল।

(বৈশাখ সংখ্যা থেকে নবকল্লোলে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে)

Registration No. W. B./RNP/93 April 2001 "Suktara"

গহনা আমার গর্ব, গহনা আমার প্রাণ !

- হীরের অলংকার
- খাঁটি সোনার গহনা
- সেরা জ্যোতিষ গণনা

দি সেনকো জুয়েলারী প্যালেস
১৯৯ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।
ফোন ঃ ২৪১-৬১০১/১৯৫৮, ফ্যাক্স ঃ ২১৯-২৫৬১

নিউ সেনকো জুয়েলারী হাউস
১৯৫/১ রাসবিহারী এভিনিউ (বিজন সেতুর কাছে),
কলিকাতা-১৯। ফোন ঃ ৪৪০-৪৬৯৫, ৪৪০-০২৩৮

সেনকো জুয়েলারী হাউস
১৭০/২ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।
ফোন ঃ২৪১-৭১০৪/৯৫৮৫/২১৯-২৫৬২, ফ্যাক্স ঃ ২৪১-৯৫৮৫

সেনকো জুয়েলারী প্যালেস
১১৮ রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-২৯ (লেকমার্কেট)।
ফোন ঃ ৪৬৬-৬১২৪/৪৬৩-৩৬১৫